জাপানি জর্নাল

প্রচ্ছদ ও ছবি : সুব্রত ত্রিপাঠী

সাড়ে তিন টাকা

জাপানি জর্নাল

বুদ্ধদেব বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ১২

এই পুস্তকে দুটি নতুন অক্ষর ব্যবহার করা হ'লো—
ও ঝ়। প্রথমটির উচ্চারণ ইংরেজি z-এর মতো, যথা
জ়েন = Zen। জ-এর তালব্য উচ্চারণ করলে যা দাঁড়া
তা-ই হ'লো ঝ়; ইংরেজি pleasure শব্দের s-এ এ
ধ্বনি আমাদের পরিচিত।

ভিতরকার ছবিগুলি একটি পুরোনো জাপানি চিত্র
পর্যায় অবলম্বনে অঙ্কিত।

বু.

হের্ণার ক্রীভরিশ

বন্ধুবরেষু

শীত, সন্ধ্যা, ওসাকা বন্দর। ভিড় নেই; প্রায় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই মাল এসে পৌঁছলো, প্রায় আমরা দাঁড়ানোমাত্র কাস্টমস তাঁদের খড়ির দাগ এঁকে দিলেন, আধ মিনিটে টাকা ভাঙিয়েই ছুটি। কোনো নতুন দেশে প্রথম এসে এত সহজে এয়ারপোর্টের বেড়া ডিঙোতে পারিনি; হয় ভাগ্য আমাদের আজকের তারিখে দয়া করেছেন, নয় এখানকার ব্যবস্থাই উত্তম। আমরা লাউঞ্জে পৌঁছবার আগেই কাচের দরজা ঠেলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর চলন দেখে মনে হ'লো তিনি আমাদের আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুশ্রী আধা-বয়সী ভদ্রলোক, আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থামলেন, কোমর থেকে দেহের ঊর্ধ্বাংশ নত ক'রে বললেন,

২

'আমার নাম কেনিচিরো হায়াশি, আপন
অভ্যর্থনা জানাই, আমরা কয়েকজন আ
করছি আপনাদের জন্য। [illegible]
[illegible]
কেউ যুবক, কারো চুল [illegible]
সকলেই অধ্যাপনা করেন [illegible]
কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে। হায়াশি তাঁদে
ও পদবিগুলো ব'লে গেলেন ; বিনতি, ক
পুনশ্চ বিনতির বিনিময় হ'লো। তারপর
সাতজন আধো চাঁদের আকারে ঘিরে দাঁ
আমাদের, গম্ভীর মুখে, প্রায় আনু
ভঙ্গিতে ; সকলের প্রতিনিধি হ'য়ে কথা ব
একজন মাত্র। ইনি য়ুটাকা ওজিহারা, কি
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক,
ছিপছিপে লম্বা, চোখে-মুখে উৎসাহ
করছে। অনেকবার কেশে, অনেকবার
তিনি তাঁর অনভ্যস্ত ইংরেজি ভাষায় ক্ষুদ্র
বক্তৃতা করলেন। প্রথম কথা : আ
উদ্দেশে তাঁদের সকলের প্রীতি ও আন্তরি
দ্বিতীয় : আমাদের আগামী তিন দিনে
সূচি। তাঁর উপস্থাপনায় কোনো অনুপু

[illegible]

এ-রকম ছবির মতো অভ্যর্থনা আর কোথাও দেখিনি। যখন আমরা মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠছি, তখনও এঁরা ছবির মতো বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে, কাল সকালের কর্তব্য আরো একবার মনে করিয়ে দিলেন। আমি বুঝে নিলুম, জাপানি শিষ্টাচার অতিশয় সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত ; সেই উচ্চগ্রামে পৌঁছতে হ'লে— শুধু আমরা কেন, অন্য যে-কোনো মানব-সম্প্রদায় হাঁপিয়ে পড়বে।

কারখানা, আবাসিক পল্লী, প্রত্যেক ল্যাম্পোস্টে সচিত্র বিজ্ঞাপন ঝুলছে, হঠাৎ এক-এক জায়গায় গাছপালার ফাঁকে তারার ঝিকিমিকি—এই সব পেরিয়ে কিয়োটোর দিকে চললুম। হায়াশি আমাদের সঙ্গে আছেন, সঙ্গেই থাকলেন রাত্তির প্রায় এগারোটা পর্যন্ত।

আমরা যতক্ষণে আহারের জন্য তৈরি
ততক্ষণে কিয়োটো হোটেলের বড়ো ভোজ
বন্ধ হ'য়ে গেছে ; বেসমেন্টে, রান্নাঘরের
একটি ছোটো কামরায় কোণের টেবিলে
একসঙ্গে অন্তরঙ্গ আহার করলুম আ
ঘরটিতে জাঁক-জমক নেই, কিন্তু আ
ত্রুটিহীন, সুগম্ভীর পরিচারকের বদলে এ
আছে বেতসকান্তি পরিচারিকারা, ব
গাত্রবাস মালার্মের কবিতার মতো
হ'লেও মুখের ভাব কাঠিন্যহীন। কি
মনে হ'লো নিজেকে—দ্রুত ভ্রমণের পথে
এই ভাবটি সুলভ নয়—নিশ্চয়ই তার
কারণ হায়াশির স্নিগ্ধ সংস্রব। আমি
পর প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছি, আর হায়াশি
দিচ্ছেন ধীরে, মৃদু গলায়, শব্দগু
সুচিন্তিতভাবে সন্ধান ক'রে-ক'রে। পার
সঙ্গলোভ আমাদের ভোজনকে দীর্ঘায়িত ক
যতক্ষণ না দরজা বন্ধ করার সময় হ'লো,
আমরা উঠলুম না। যখন শুতে গেলু
হ'লো জাপান আমাদের অনেকদিনের চে

আমি মানুষটা কিছু দীর্ঘসূত্রী, আর তা আমার অজানা নেই, তাই কোনো নিয়োগের জন্ম অনেক আগে থেকে তৈরি হ'তে আরম্ভ করি। কিন্তু আজ সকালে কী বিভ্রাট হ'লো জানি না; ঘরে যখন টেলিফোন বাজলো তখনও আমাদের প্রাতরাশ হয়নি। আমাদেরই দোষ: ওজিহারার ন-টার সময় আসার কথা, ঘড়ির কাঁটায় ন-টাতেই তিনি এসেছেন। ছুটলুম নিচে; ট্যাক্সি—রেল-স্টেশন—পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ট্রেন ছাড়বে। 'এটা ছেড়ে দেয়া কি সত্যি অসম্ভব?' অনুনয় না-ক'রে পারলুম না আমি, 'কোনোরকমে এক পেয়ালা চা যদি···আপনার কি মনে হয় না পরের ট্রেনে গেলেও সময় থাকবে?' 'তা

থাকবে,' ওজিহারা ঘড়ির দিকে চোখ ফেল
'কিন্তু এই ট্রেনেই আমাদের যাবার কথা
—আচ্ছা, চলুন—ঐ দোতলায় রেস্তো
—পনেরো মিনিট বাদে পরের ট্রেন।'
প্রভূতভাবে ধন্যবাদ জানালুম তাঁকে, প্রভূত
উপভোগ করলুম ঝকঝকে পরিষ্কার
ঝকঝকে সুন্দর বাসনে ত্বরান্বিত প্রাত
আসন্ন কর্মসূচির জন্য অনেক বেশি প্রস্তুত
হ'লো নিজেকে।

আধ ঘণ্টা পরে।

ওসাকা স্টেশনে ট্রেন থেকে
ধরেছি, দুটি যুবক—বিশ্ববিদ্যালয়ের
থেকে আমাদের সহযাত্রী।
আমার পাশে দাঁড়ানো যুবকটি
গলা মাঝে-মাঝে কানে শুনছি,
কথাও ধরতে পারছি না—হঠাৎ
আবিষ্কার করলুম তিনি বাংলা বল
ওয়ের পরে ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে এঁ
পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। আম
যেখানে চলেছি সেটা ওসাকার বৈদেশিক
বিদ্যালয়, ইনি সেই প্রতিষ্ঠানের স

নাম নরিহিকো উচিদা। 'সেখানেই বাংলা শিখেছেন?' 'না, সেখানে হিন্দি পড়ানো হয়, কিন্তু বাংলার জন্য ব্যবস্থা নেই।' 'তবে?' উত্তরে শুনলুম, তিনি বাংলা শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বই প'ড়ে-প'ড়ে, কোবের একজন জাপানি-জানা বাঙালি বাসিন্দার কাছে মাঝে-মাঝে সাহায্য নিয়ে। 'আশ্চর্য!'—আমার মন সবিস্ময় প্রশংসায় ভ'রে গেলো। তাঁর আকাশের তিন তারার নাম শরৎচন্দ্র, সত্যজিৎ রায় ও [illegible], একবার বাংলাদেশ চোখে দেখা তাঁর গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। 'আপনাদের দেশে—এখন কি—প্রেম-বিবাহ—হয়?' উচিদার এই প্রশ্ন শুনে আমি বুঝতে পারলুম শরৎচন্দ্র রমা-রমেশের বিয়ে না-দিয়ে কত ভালো করেছিলেন; 'প্রেম-বিবাহ' হোক, এই ইচ্ছেটা সকলের মনে জ্বলতে লাগলো, এমনকি এই বাট দশকের জাপানি যুবকও তার টান এড়াতে পারলেন না। 'তা কিছু-কিছু হয় বইকি। আর আপনাদের দেশে?' 'হ্যাঁ—না—মানে—' যা বলতে চাচ্ছেন তা প্রকাশ করার মতো ভাষা

জুটলো না উচিদার, কিন্তু ম্লান হাসি দেখে আমি বুঝলাম এঁর সাধু অধ্যবসায় ভাষাশিক্ষায় সার্থক হ'লেও হার্দ্য ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সিদ্ধিসাপেক্ষ।

গন্তব্যে পৌঁছনো গেলো। কাল সন্ধ্যায় এয়ারপোর্টে যেমন, এখানেও তেমনি। ভাষা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন অপেক্ষায়, একে-একে অভিবাদন ক'রে অতি যত্নে ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের, আধ মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকে পূর্বনির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হলেন। এঁদের চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি সূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপ—সব ঠিক ছবির মতো। উপমার এই পুনরুক্তি পাঠককে মার্জনা করতে হবে, কেননা আর-কোনো উপমা নেই। 'যন্ত্রের মতো'ও বলা যেতো, কিন্তু তাতে এইটুকু ভুল হয় যে প্রাশিয়ানদের সঙ্গে জাপানিদের তফাৎটা ধরা পড়ে না। পাশ্চাত্ত্য জাতির যে-সব সামরিক অভ্যাস এখন সামাজিক গুণে পরিণত হয়েছে (শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, ইত্যাদি) সেগুলো সবই জাপানিদের আয়ত্ত, এমনকি তাদের পক্ষে

স্বাভাবিক [illegible]
ঐতিহ্যে লালিত), কিন্তু সেই সঙ্গে [illegible]
লাবণ্য এদের সহজাত, এবং এ-দুয়ের [illegible]
জন্যই বিদেশীর কাছে জাপান [illegible]
মুগ্ধকর। একটি সামাজিক অভিবাদনে [illegible]
শ্রী ও সৌষ্ঠব ব্যক্ত হ'তে পারে, তা বুঝতে
হ'লে জাপানে আসা ভিন্ন উপায় নেই।

আমরা বসেছি বড়ো-বড়ো আরাম-কেদারায়, প্রত্যেকের সামনে একটি ক'রে নিচু টেবিল রাখা আছে, হাতের কাছে ছাইদান, কাচ-আঁটা জানলার বাইরে শীতের ফুল মাথা নাড়ছে বাগানে। কেন্দ্রীয় তাপ নেই, তার বদলে কয়েকটা লোহার চুল্লিতে [illegible]কয়লার আগুন জ্বলছে, সেগুলো ঘরের [illegible]ভাবে ছড়ানো যাতে সকলেই কিছু-না[illegible] পায়। একটি মেয়ে ঘরে এসে বিনা[illegible] টেবিলে-টেবিলে একটি ক'রে পেয়ালা রেখে চ'লে গেলো। চা, কিন্তু জাপানি চা—চেখে দেখি, গরম জলেরই নামান্তর, অন্তত বাঙালির পক্ষে তা-ই। কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো যে অতিথি এসে পৌঁছনোমাত্র এঁরা

[illegible] আমার বক্তৃতা। [illegible] [illegible] বক্তৃতার দু-এক মিনিট আগে [illegible] ঘরে ফিরে এসে বসা-মাত্র খাদ্য পরিবেশিত হ'লো। সেই আরাম-কেদারায় ব'সে, আলাদা-আলাদা নিচু টেবিলেই খাওয়া। ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে এনে দিলে ভাত, কিছু শাকসব্জি, মাংস, ফল, সবশেষে আবার চা। আহারে একটু দেরি হ'লে আমার আপত্তি ছিলো না, যাকে বলে গা ছেড়ে দিয়ে বি[illegible]র করতে পারলে বরং ভালোই লাগ[illegible] ব্যবস্থার নড়চড় হবার উপায় [illegible] আমাদেরও তাড়া আছে একটু, [illegible] কুড়ি মাইল দূরে কোবেতে কিছু বলতে হবে আমাকে।

কোবের পথে দৃশ্য বদলে গেলো। সারি-সারি পাহাড়, রোদে তাদের নীল রং বেগনি দেখাচ্ছে, ধাপে-ধাপে কাঠের, কংক্রীটের বাড়ি, চলতি চোখেও বোঝা যায় অধিবাসীদের অবস্থা

গেলো। দুটি সুন্দরী পরিচারিকা হাঁটু ভেঙে ব'লে অভ্যর্থনা জানালে, ঢেউ-খেলানো ভঙ্গিতে ঘাসের চটি এগিয়ে দিলে সকলকে। খাশ জাপানি ঘরে রাস্তার জুতো পায়ে কেউ ঢোকে না; টুপি ওভারকোটের মতো চর্মপাদুকাও বাইরে ত্যাজ্য। দুটো ছোটো কামরা পেরিয়ে খাবার ঘরে এলাম। বাঁশ আর কাঠ মিলিয়ে দেয়াল, কাঠের মেঝে সূক্ষ্ম মাদুরে আবৃত। দেয়ালে ঝুলছে জাপানি চিত্রকলার নমুনা, টবে রাখা বেঁটে গাছের ভঙ্গিমায় এদের উদ্ভিদবিদ্যার প্রমাণ দাঁড়িয়ে। আসবাবের মধ্যে কয়েকটি নিচু ও চৌকো টেবিল (নিচু মানে আমাদের জলচৌকির মতো), তাদের ঘিরে ধবধবে শাদা কুশান পাতা, পিছনে একটি ক'রে লোহার চুল্লি তাপ বিলোচ্ছে। এক-এক টেবিলে চারজন ক'রে বসা হ'লো। টেবিলের মধ্যস্থলে গোল ক'রে খাঁজ কাটা, তাতে রক্তবর্ণ গালার পাত্র বসানো। আমরা বুঝতে পারিনি ওটার কী ব্যবহার, কিন্তু একটু পরে দেখা গেলো তারই তলায় কাঠকয়লার উনুন জ্বলছে—ঐ পাত্রেই রান্না হবে। পরিচারিকারা দিয়ে গেলো প্রতি-

কাঁচা মাছকে এমন নির্বাস ও স্নিগ্ধ ক'রে ...ল, এটা আমার কাছে এক সমস্যা হ'য়ে ...লো। হয়তো মাছটা কোনো বিশেষ জাতের, ...া শুধু জাপানি জলেই পাওয়া যায়; অন্ততপক্ষে অভিজ্ঞদের মুখে শুনেছি যে জাপানের বাইরে অপক্ক মৎস্য সুখাদ্য নয়—জাপানি রেস্তোরাঁতেও না।

এই সুকিয়াকিতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমার মনে হচ্ছে যে ভোগের বিষয়ে জাপানিদের উৎসাহ যেমন মিতাচারও তেমনি, আর এদের বিখ্যাত 'সৌন্দর্যবোধে'রও মূল কথাটা বোধহয় এই। এদের আছে ইহলোকের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা (যা আমাদের নেই), আর সেই সঙ্গে এক ব্যবহারিক অণিমাসিদ্ধি (যা ভারতীয়, পাশ্চাত্ত্য বা এমনকি চৈনিক সভ্যতায় অভাবনীয়)। ভূষণের বিরলতার জন্যই এদের ঘর সুন্দর, এদের তানকা কবিতা ক্ষমাহীনভাবে একত্রিশ অক্ষরে সীমিত, এদের ছবিতে বস্তুর তুলনায় ফাঁকা বেশি, নো নাট্যের মেয়াদ আধ ঘণ্টা, আর এদের ভোজন স্বাদু, সুদৃশ্য, স্বাস্থ্যকর ও স্বল্পমাত্রিক। খৃষ্টান শাস্ত্রে (আমাদের মহাভারতেও)

অতিভোজন মহাপাপের অন্যতম, কিন্তু জাপানি সমাজে তার যেন সুযোগই নেই; তাদের পাত্র-গুলির ক্ষুদ্রতাই সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই

রকম ছোটো-ছোটো পাত্রে চীনেরাও পরিবেষণ করে, একসঙ্গে অধিক পরিমাণ সামনে আনে না, কিন্তু এই প্রথার পরিপূরক হিশেবে তাদের ব্যঞ্জনসংখ্যা অগুনতি। রেঙ্গুনে দু-একবার পূর্ণাঙ্গ চৈনিক ভোজে আহূত হ'য়ে দেখেছি, ব্যাপারটা ক্রমশই দশাননের যোগ্য হ'য়ে উঠছে, বাহিনীর শেষ দেখা যাচ্ছে না, ঘর্ম ও ঘণ্টার ক্ষরণ অনিবার্য ও অভিপ্রেত। জাপানি সভ্যতায় চীনের অবদানের কথা কারোরই অজানা নেই; অনেক বিষয়ে প্রতীচীর আক্ষরিক অনুকরণও এখানে বদ্ধমূল; কিন্তু 'জাপান' বলতে আবহমান-ভাবে যা-কিছু আমাদের মনে পড়ে—চারুতা, সৌকুমার্য, নির্ভার ন্যূনোক্তি—তারই একটি প্রতিরূপ আমি সুকিয়াকিতে দেখতে পেলাম।

শুধু একটা জিনিশ ভালো লাগলো না; আমরা যাকে এঁটো বলি সে-বিষয়ে এরা একে-বারেই অবহিত নয়; একই শলাকা দিয়ে সূপকার নিজেও খাচ্ছেন, রান্নাও নাড়ছেন,

২৫ জানুয়ারি

আজ সকালে একটা পুরোনো [illegible] দেখেছি [illegible]ছি; আমাদের সঙ্গী হায়াশি-দম্পতি আর মাস্তু।

দীর্ঘ বীথিকা উঁচু হ'য়ে উঠে গেছে, তার প্রান্তে মঠের দ্বার। বীথিকার দুই দিক চেরি গাছে নিবিড়, মঠের উদ্যানেও তার প্রাচুর্য। চেরি, কিন্তু শীতে পুষ্পহীন ও পিঙ্গলবর্ণ; গাছগুলোর উচ্চতা এমন যে 'তরু' না-ব'লে 'বৃক্ষ' বললে শোভা পায়; আমেরিকায় এদের জ্ঞাতি যাদের দেখেছি তারা আকারে আরো ছোটো ব'লে মনে পড়ে। মঠের উদ্যানটি বিস্তীর্ণ, বন্ধুর ও আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো, অর্থাৎ এক সযত্ন যত্নহীনতার দ্বারা শিল্পিত ও প্রাকৃতের মধ্যে ভেদরেখা অস্পষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে;

[illegible]

একটি যুবক হিন্দু আমাদের পথদর্শক।

ভিতরটা ঠাণ্ডা, নিরাভরণ* ও নিরানন্দ—অক্সফোর্ডের কোনো প্রাচীন ছাত্রাবাসের মতো। এই তুলনা অন্ত দিক থেকেও সার্থক, কেননা 'ধর্ম' বলতে হিন্দুর মনে যে-সব অনুষঙ্গ জেগে ওঠে এখানে তার প্রায় কিছুই নেই (থাকতেও পারে না); আমাদের হিশেবে এটি একটি শিক্ষায়তন, এবং শিক্ষণীয় বিষয়টিও 'ব্রহ্মবিদ্যা'র

---

* অর্থাৎ, হিন্দু বা রোমান ক্যাথলিক মন্দিরের তুলনায়। দেয়ালের কোনো-কোনো অংশ সিঁদুরবর্ণে রঞ্জিত, প্রাচীরচিত্রে বুদ্ধজীবনীও দেখা গেলো, কিন্তু আমরা যাকে 'রস' বলি তার কোনো আয়োজন নেই। আর তা নেই ব'লেই যেন এখন প্রতীচীর একটি উৎসাহের বিষয়।

[illegible]

কৌতূহল ছিলো, কিন্তু আজ তন্ত্রের কোনো অধিবেশন নেই; একটি বৃহৎ ও শূন্য কক্ষে একজন আচার্য আমাদের অভ্যর্থনা করলেন; সেখানে কতগুলো কাষ্ঠদণ্ড দাঁড় করানো আছে —তা দিয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা পরস্পরকে প্রহার ক'রে থাকেন, জেন তন্ত্রের এটি একটি অঙ্গ।

বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ঐতিহ্যের 'প্রটেস্টাণ্ট' শাখা বলা যেতে পারে; অন্তত এ-কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদই প্রথম, মহত্তম, ও সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে কেন টিকলো না তার কারণ আলোচনা করার তিলতম যোগ্যতা আমার নেই; কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে ভারতীয় হিন্দুর মনে একদিকে যেমন পৌত্তলিকতা বদ্ধ-

[illegible]

বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও বৈচিত্র্যলাভ ঘটেছিল। জাপানি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায় কুড়িটি (তাদের উপশাখা অসংখ্য), তার মধ্যে জেন প্রাচীনতম না-হ'য়েও অধুনা সবচেয়ে বিখ্যাত। বোধিধর্ম, এক ভারতীয় বৌদ্ধ, ছয় শতকের প্রারম্ভে চীনে এসে ছয় বৎসরকাল এক নিরঞ্জন দেয়ালের দিকে বদ্ধনেত্র হ'য়ে নিঃশব্দে ও অনবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করেছিলেন*—অন্তত তাঁর বিষয়ে এটাই কিংবদন্তী। ইনিই জেন-এর ঐতিহাসিক জনক; একে পরবর্তী কালে জাপানে নিয়ে আসেন কনফ্যুশীয় চৈনিক পরিব্রাজকেরা; স্থানীয় শিন্টো (দেবমার্গ) ও বুশিডো (যোদ্ধ-

---

* জেন শব্দটি 'ধ্যান'-এর অপভ্রংশ।

মার্গ)-র সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে এই বুপ্পো (বুদ্ধ-মার্গ) এখানে এমন একটি নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকের মতে জাপানের আত্মা নিষ্কলভাবে বিধৃত।

হয়তো খুব ভুল হবে না, যদি বলি বৌদ্ধ মার্গে জেন সম্প্রদায় চরম 'প্রটেস্টান্ট'। তত্ত্ব, শাস্ত্র, আচার, উপদেশ, মন্ত্র, পূজা, অনুশাসন— যা-কিছু অবলম্বন ক'রে কোনো ধর্ম তার কলেবর লাভ করে—সব বর্জন করেছেন এঁরা; শাক্যমুনিকে দৃষ্টান্ত হিশেবে মানলেও গুরু অথবা অবতারে এঁরা আস্থাহীন; অন্যেরা যাকে জ্ঞান বলে—যা বুদ্ধি ও সচেতন প্রয়াসের দ্বারা লভ্য—এঁদের মতে সেটাই ভ্রান্তি। স্বজ্ঞা ছাড়া আশ্রয় নেই এঁদের; ধ্যান ভিন্ন পদ্ধতি নেই, এবং জগতের যে-কোনো বস্তু এঁদের ধ্যানের বিষয় হ'তে পারে—একটি ফুল, কুমড়ো, এক বস্তা আলু, কিছুই উপেক্ষণীয় নয়, কেননা 'আসলে' সব-কিছুর মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। একটি ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দ্রষ্টা যখন নিজেকেই ফুল ব'লে উপলব্ধি করেন (অর্থাৎ, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদ যখন লুপ্ত

হ'য়ে যায়), তখনই তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ হ'লো— খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা হ'লো এই। না-বললেও চলে, এই অবস্থায় পৌঁছনো সহজ নয়, তা বহু-বৎসরব্যাপী প্রযত্নসাপেক্ষ; আর আচার্যের উপদেশ না হোক উপস্থিতির প্রয়োজন আছে (সেইজন্যেই মঠ)। আচার্যের কাজ হ'লো— প্রশ্নের কূট উত্তর দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে (যষ্টির দ্বারা আঘাত, আসন থেকে অতর্কিতে নিক্ষেপ, আকস্মিক অর্থহীন চীৎকার—সবই বিধেয়) শিষ্যকে অনবরত এমনভাবে চমকে দেয়া যাতে সে বুদ্ধির মোহজাল থেকে ধীরে-ধীরে মুক্ত হ'য়ে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে। এবং একবার সেই উত্তরণ ঘটলে (পারিভাষিক নাম 'সাটোরি') আর-কোনো সমস্যা থাকে না, এক মহামৌন বিশ্বের স্বরূপ উন্মীলিত করে, ভাষা, চিন্তা, চেষ্টা—সব অবান্তর হ'য়ে ঝ'রে যায়।

এ-কথা কি সত্য নয় যে ভারতীয় বৌদ্ধ যুগেও হিন্দু মানস প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে গেছে? কেননা অজ্ঞাবাদী তথাগতের আমরা নাম দিয়েছি 'ভগবান বুদ্ধ', 'অবদানশতক' (দৃষ্টান্ত: 'নটীর পূজা'র শ্রীমতী) ভক্তিরসে উচ্ছল, এবং

অজন্তা-চিত্রও হার্দ্য আবেদনে বলীয়ান? কিন্তু জেন ধর্মে জ্ঞান যেমন বর্জনীয় তেমনি প্রেমেরও স্থান নেই; এবং বুদ্ধি ও হৃদয়, বিচার ও বিশ্বাস যুগপৎ পরিহার্য হ'লে যা অবশিষ্ট থাকে তা এত বেশি সূক্ষ্ম যে বাইরে থেকে সব রাস্তাই বন্ধ মনে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় সব তন্ত্রই স্ববিরোধে আক্রান্ত; ভাষার অর্থহীনতা প্রমাণের জন্য জেন মুনিরা যেমন লক্ষ কথা লিখে গেছেন, তেমনি তাঁদের শূন্যবাদ, অসবর্ণ চৈনিক সৌন্দর্যচর্চার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে, এমন কয়েকটি ক্রিয়াকর্মের জন্ম দিলে, যা পরতে-পরতে বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত ও আনুষ্ঠানিক। আমাদের ভাষায় যা ব্রত, জাপানের চা-অনুষ্ঠান তা-ই, আমাদের দেব-মূর্তির মুদ্রার মতো নো নাটকে প্রতিটি ভঙ্গি অর্থপূর্ণ; এবং এই সবই জেন-এর অবদান, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলাতেও তার প্রভাব দূরস্পর্শী। সাধনার লক্ষ্য যেখানে নির্মমভাবে অরূপ সেখানে রূপের এই বিচিত্র আবির্ভাব এ-কথাই প্রমাণ করে যে কোনো-না-কোনো রকম প্রতিমা ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না।

মঠ দেখা শেষ হ'লে, সংলগ্ন ভোজনশালায়

হায়াশি আমাদের নিয়ে এলেন। কাননে ঘেরা একতলা কাঠের বাড়ি, পরিবেশ মনোরম, সারি-সারি কয়েকটি ঘর-বরাবর রৌদ্রপ্লাবিত বারান্দা চ'লে গেছে। একটি কামরা, আমার মনে হ'লো, হায়াশি আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমরা বারান্দায় উঠতেই সহাস্য ও ভাষাহীন অভ্যর্থনা জানালেন এক প্রৌঢ় ভিক্ষু, তিনিই বোধহয় ভোজনশালার পরিচালক। এতক্ষণ ধ'রে শীতে কাঁপার পরে ভালো লাগলো রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে চুল্লিতে হাত সেঁকতে। খাওয়া হ'লো জাপানি ধরনে—নিরামিষ, কিন্তু সাকে দিলে। বেরিয়ে আসার সময় বারান্দায় ছুটি গেইশা-মেয়েকে দেখলুম; তাদের খোঁপা জটিল ও বিরাট, গায়ে চিত্রিত কিমোনো, মুখে পাণ্ডুর প্রসাধন। ছেলেবেলায় পড়া 'জাপানি ফানুষ' বইটা মনে প'ড়ে গেলো আমার; মনে হ'লো এরা সেই রূপকথা থেকে উঠে এসেছে।

প্র. ব. সওদা করতে বেরোলেন, মাসু তাঁর সঙ্গিনী ও পরামর্শদাত্রী, আমি অগত্যা অনুচর।

ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার ধারণা হ'লো যে জাপানিরা ভারি সুদর্শন জাত। আমরা এদের বেঁটে ব'লে ভাবি—সেটা ভুল; আমরা ভাবি এদের নাক চ্যাপ্টা—সেটাও ভুল। লম্বা, সুগঠিত নাসা—এমন লোক রাস্তায় অগুনতি। গায়ের রং চীনেদের মতো হলদে নয়, বরং গোলাপির দিকে, চোখের কোল ফোলা-ফোলা কিন্তু আকার ছোটো নয়; মুখের ছাঁদ আমাদের পক্ষে অচেনা হ'লেও অনেক মুখ আমাদের (বা অন্য যে-কোনো) হিশেবে, সুশ্রী। স্বাস্থ্য ভালো, পোশাক

ভালো (বিলেতি সাজ মেয়ে পুরুষে সার্বিক) ; রোগা, মোটা বা বেঢপ বলা যায় এমন চেহারা প্রায় চোখেই পড়ে না (তার কারণ কি এদের স্বল্লাহার, রান্নার ধরন, জুডো ব্যায়ামের অভ্যাস?) ; সকলকেই দেখছি পুষ্ট, আঁটো-সাঁটো, সতেজ, শীতের বিরুদ্ধে যথোচিত-ভাবে আচ্ছাদিত। একটা নতুন জিনিশ চোখে পড়লো : কেউ-কেউ নাকের ডগা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত এক টুকরো পাৎলা কাপড়ে ঢেকে নিয়েছে ; অনুমান করছি এটা শীত ঠেকাবার একটি দৈশিক ও সাবেকি উপায়, এবং এই লোকেদের অবস্থা অসচ্ছল। কিন্তু এদের বসনও এমন নয় যাকে দীন বলা যায়, হ'তে পারে পশমি কাপড়টা জাতে নিচু, কিন্তু ছাঁটেকাটে সুদৃশ্য, তাপরক্ষায় অক্ষম ব'লেও মনে হয় না।

রাস্তায় যারা চলছে, দোকানে যারা কেনা-বেচা করছে, তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ সংখ্যায় সমান-সমান। ন্যু ইয়র্কে মেয়েদের সংখ্যা বেশি হ'তো, কলকাতায় (রাসবিহারী এভিনিউতে ছাড়া) মেয়েরা হ'তো পুরুষের দশমাংশ।

'নারী-প্রগতি'র ব্যাপারে জাপানে এখন ইংলণ্ডের মতো অবস্থা; প্রায় সব কাজেই মেয়েদের দেখা যায়, কিন্তু দেশটাকে মেয়েদেরই রাজত্ব ব'লে মনে হয় না (যা আমেরিকায় কখনো-কখনো হ'য়ে থাকে)। নম্রতায় প্রাচ্য, অথচ অন্তঃপুরজাত জড়িমার লক্ষণ একেবারেই নেই—এই হ'লো আজকের দিনের জাপানি মেয়ে। বোধহয় ভুল হ'লো কথাটা, কেননা জাপানি মেয়েদের কোনোকালেই ঠিক অন্তঃপুরে অন্তরীণ হ'য়ে থাকতে হয়নি, তাদের 'মুক্তি' সাম্প্রতিক ঘটনা হ'লেও তার কারণ শুধু প্রতীচীর অভিঘাত নয়। বরং এ-কথাই সত্য যে মধ্যযুগে (জাপানে সেটাই প্রাচীনকাল) জাপানি মেয়েদের যে-রকম সুপরিণত ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদা দেখা গিয়েছে, সমকালীন ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

আমরা জানি, কিন্তু সব সময় ভেবে দেখি না, যে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের মনে কতগুলো দুর্বলতা গেঁথে দিয়ে গেছে। 'প্রাচ্য' বলতে শ্বেতাঙ্গের মনে যে-গতানুগতিক বিম্ব ভেসে ওঠে (ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী, নীতিজ্ঞানহীন,

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন), আমরা সেটাকেই অন্ধের মতো মেনে নিয়েছিলুম। আজকের দিনেও, কোনো য়োরোপীয় সতীদাহের উল্লেখ করলে আমরা বড়ো লজ্জা পাই, মনে রাখি না যে য়োরোপে আঠারো শতকেও 'ডাইনি' পোড়ানো হ'তো।* কেউ বহুবিবাহের কথা তুললে আমরা কেমন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে পড়ি; ভুলে যাই যে য়োরোপের রাজন্যসমাজেও ঐ প্রথা সম্মানিত ছিলো, শুধু অন্যান্যরা নামতও স্ত্রীর পদ পেতেন না রক্ষিতারূপেই বিখ্যাত হতেন। কোনো ত্রয়োদশী বালিকা, পিতার মনোনীত পাত্র বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে তার বরাদ্দ হ'তো বেত্রাঘাত; আঠারো শতকে সুইফট আক্ষেপ করেছেন এই ব'লে যে স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক মেলামেশা, প্যারিসে প্রচলিত হ'য়ে থাকলেও,

---

* সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' দেখে আমি প্রচুর কেঁদেছিলাম, কিন্তু ভেবে পাইনি সতীদাহের দৃশ্যটি তিনি কেন দেখালেন। শেক্সপীয়রের জীবনী নিয়ে আধ ঘণ্টার ছবি তৈরি হ'লে তাতে ধর্মদাহের দৃশ্য কি অপরিহার্য?

লণ্ডনে অসম্ভব, আর সেইজন্যেই ইংরেজ ভদ্রলোকের আচার-ব্যবহার এমন স্থূল ও রুচিভ্রষ্ট। জানি, অন্য কারো অন্যায়ের দ্বারা নিজেদের অন্যায়ের সমর্থন হ'তে পারে না, আর এ-কথাও কে না মানবে যে মেয়েরা, শুধুমাত্র মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে ব'লেই, আজকের দিনেও ভারতে যে-হীনতা ও নির্যাতন ভোগ ক'রে থাকে, তার অমানুষিকতা অকথ্য। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সামাজিক অবিচার বা অত্যাচার কোনো একটি মানব-সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, সব দেশেরই ইতিহাসে তার কালো অধ্যায় অনেক ছড়িয়ে আছে; আর আজকের দিনে আমরা যাকে মানবধর্ম বলছি তার আদর্শে সমাজগঠন সর্বত্রই সাম্প্রতিক ঘটনা। জর্জ সাঁ, য়োরোপের প্রথম 'আধুনিক' বিদ্রোহিণী, তাঁর মৃত্যুর পরে একশো বছরও এখনো কাটেনি; আর সেখানে মেয়েরা সামগ্রিকভাবে 'মুক্ত' হলেন মাত্রই প্রথম মহা-যুদ্ধের পরে। ভারতেও (অন্তত নগরগুলিতে) দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে ও পরে মেয়েদের অবস্থা যে-রকম দ্রুত ও বিপুলভাবে বদলে গেলো, তা

চিন্তা করলে আমি পর্যন্ত অবাক হ'য়ে যাই ; আর সেই পরিবর্তনের গতি যেহেতু স্বাধীনতার পরে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই মনে হয় যে আমাদের দেশে নারীনিগ্রহ অতীত হ'য়ে যেতে আর বেশি দেরি হবে না।

এই একটা বিষয়ে জাপান কিন্তু অবাক ক'রে দিয়েছে পৃথিবীকে ; আর কোন্ দেশে মধ্যযুগেও শিক্ষিত হতেন মেয়েরা, শিল্পকলা নিসর্গপ্রীতির চর্চা করতেন, নিজেদের উপলব্ধি করতেন—স্ত্রী, মা, বোন বা সন্ন্যাসিনী নয়—নিতান্ত একজন ব্যক্তি ব'লেই ? যে-কালে য়োরোপ বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মেয়েদের প্রায় অস্তিত্বই নেই, সেই এগারো শতকে জাপানি সাহিত্যের যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা প্রায় সকলেই মহিলা। শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি কাহিনী', শোনাগনের ডায়েরি বা 'বালিশ-পুঁথি' (নাম-করণে বোধহয় বোঝানো হচ্ছে যে বইখানা ঘুমের আগে শুয়ে-শুয়ে পাঠযোগ্য), শ্রীমতী শিকিবুর কবিতা—এই সবই জাপানি সাহিত্যের চিরায়ত অংশ ব'লে স্বীকৃত, উপন্যাসে তো

মুরাসাকির নাম আজ পর্যন্ত দুই অর্থেই প্রথম। এঁরা তিনজন সমকালীন ও সমবয়সী, একই সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদে সখীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এই তিনজন শ্রেষ্ঠ ব'লে ব্যতিক্রম নন; জাপানের এই হেইয়ান যুগে আরো অনেক মহিলা সাহিত্যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ডায়েরি লেখার প্রচলন করেন তাঁরাই, আরো আশ্চর্য যে কবিদের মধ্যেও পুরুষের চাইতে মেয়ের সংখ্যা কম নয়। ঐতিহাসিক অর্থে পৃথিবীর প্রথম গদ্য উপন্যাস যদি নাও বলা যায়, তবু 'গেঞ্জি মনোগাটারি'কে পৃথিবীর প্রথম আধুনিক উপন্যাস ব'লে মেনে নিতে আমরা বাধ্য, কেননা এটি শৃঙ্খলিত ছোটো-গল্পের পর্যায় নয়, অলৌকিকেরও স্থান নেই এতে, আছে বাস্তব তথ্য, ঘটনাস্রোত ও চরিত্রচিত্রণ, আছে কাহিনীর কেন্দ্রনির্ভর সংহতি। এবং এই উপন্যাস এতটাই 'আধুনিক' যে এক ঘণ্টা ধ'রে পড়লে তিনবার মার্সেল প্রুস্তকে মনে পড়ে। 'ভোরবেলা প্রণয়ীর কেমন ক'রে বিদায় নেয়া উচিত'—শোনাগনের ডায়েরির এই অধ্যায়টিকে, কিছু অনুপুঙ্খ বদল ক'রে, কোনো

উনিশ-শতকী ফরাশি উপন্যাসের অংশ বললে কারো অবিশ্বাস হবে না। রচনা থেকে এই মহিলাদের যে-ছবি বেরিয়ে আসে তা সংস্কৃতির সর্বলক্ষণে প্রোজ্জ্বল; আমরা দেখতে পাই তাঁরা বুদ্ধিমতী, অন্তর্বীক্ষণে অভ্যস্ত, প্রণয়ে ও শাস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ, মানবচরিত্রে ও মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ, নিজেদের ও অন্যদের বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সক্ষম। এঁরা প্রণয়প্রার্থীকে উৎসাহিত বা নিরস্ত করেন সাংকেতিক কবিতা লিখে, ডায়েরির পাতায় পরস্পরের মর্মভেদী সমালোচনা ক'রেও এঁরা পরস্পরের গুণগ্রহণে গভীর; পুরুষদের প্রতি এঁদের আগ্রহ যে-কারণে শমিত হ'য়ে আছে তা শুধু সাংসারিক সাবধানতা নয়, সেই সঙ্গে এমন একটি উন্নত রুচি যা তাঁদের পক্ষে চরিত্রেরই নামান্তর। এবং এই সব গুণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যা তাঁদের চৈনিক সভ্যতার উত্তরাধিকার—প্রকৃতি বিষয়ে এমন একটি বিশুদ্ধ ও স্বজ্ঞাজাত অনুভূতি, যা আমরা 'ইণ্ডো-য়োরোপীয়' সাহিত্যের কোনোখানেই খুঁজে পাবো না। গাছ, ফুল, পাখি বা চাঁদের

সঙ্গে এঁরা একটি সহজ, ব্যাকুলতাহীন, স্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ, চেতনে-অচেতনে যেন ভেদ নেই এঁদের মনে, তাই দ্বন্দ্ববোধের বেদনাও নেই। রোমান্টিক আকূতির এটা ঠিক উল্টো পিঠ, কালিদাসের যক্ষের আর্তিরও পরপারে। এই ভাবটিকে আমাদের হঠাৎ মনে হ'তে পারে বড়ো বেশি শান্ত ও নিস্তাপ, কিন্তু এটাই হয়তো প্রধান কারণ যার জন্য চীনে-জাপানি কবিতা আধুনিক প্রতীচীকে এ[illegible]শ্চিতভাবে জয় ক'রে নিয়েছে। দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্লেক, গ্যেটে, বোদলেয়ার প্রভৃতি কবিদের তীব্রতায় ও ঐশ্বর্যে যখন ক্লান্তি আসে, বা তাঁদের পথে আর এগোবার উপায় থাকে না, তখন যেখানে অব্যর্থভাবে শুশ্রূষা ও সুপরামর্শ পাওয়া যায় তা এই পূর্বতম পৃথিবীর আবেগহীন, গতিহীন, এমনকি প্রায় আয়তনহীন কবিতা—এক-একটি মুহূর্তের স্থির চিত্ররূপ যেন—যা প্রতীচীর পক্ষে, ও আমাদের পক্ষেও, সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ বৈদেশিক ও অনাত্মীয়।

আর-একটা কথা উল্লেখ্য। এই মহিলারা, জর্জ সাঁ বা জর্জ এলিয়টের মতো, কখনো জেদ

ক'রে 'পুরুষ ব'নে যেতে' চাননি (বরং একজন কবি-রাজপুরুষ মহিলা সেজে ডায়েরি লিখেছিলেন); পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এঁদের কল্পনায় ছিলো না। নারীর মন দিয়েই জগৎকে দেখেছেন এঁরা, জীবনযাপনেও 'পুরুষোচিত'কে গ্রহণ করেননি, এঁদের রচনার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমরা এঁদের নারীত্বের সুঘ্রাণ অনুভব করি। মনে হয়, এমন সম্পূর্ণরূপে নারী না-হ'লে এমন সার্থক শিল্পী এঁরা হ'তে পারতেন না। এশিয়ার এই অজ্ঞাত দেশে, প্রায় এক হাজার বছর আগে, এই অঘটন কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো, তা যত ভাবছি তত আমার অবাক লাগছে।* এর আংশিক কারণ হ'তে পারে পুরুষদের মধ্যে চীনে ভাষার প্রতিপত্তি; মধ্যযুগের য়োরোপে যেমন লাতিন, তেমনি জাপানে 'সাহিত্যিক'

---

* আমি ভুলে যাচ্ছি না যে প্রাচীন ভারতেও মেয়েরা শিক্ষা ও স্বাধীনতায় হীন ছিলেন না, অন্তত আথেনীয়াদের তুলনায় তাঁদের অবস্থা ছিলো ঈর্ষা-যোগ্য, কিন্তু সাহিত্যে মহিলাদের যে-কৃতিত্ব জাপানে দেখা গেছে, তা কোনো প্রাচীন 'আর্য'কুলোদ্ভব সমাজে কল্পনাতীত।

ভাষা হিশেবে স্বীকৃত ছিলো চীনে; সে-ভাষা মহিলাদের সাধারণত শেখানো হ'তো না;* আর তাই, পাণ্ডিত্যের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হ'য়ে তাঁদের মন ও হৃদয় মাতৃভাষার স্বাচ্ছন্দ্যবেগে অমরতায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে।—কিন্তু মাতৃ-ভাষাতেও তাঁদের যে বর্ণপরিচয় হ'তো, সেটাই বিস্ময়কর। এতেও প্রমাণ হয়—যদি নতুন প্রমাণের প্রয়োজন থাকে—যে সপ্রাণ ও সবীজ সাহিত্যের বাহন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কিছু হ'তে পারে না।

---

* শ্রীমতী মুরাসাকির ভ্রাতার জন্য চৈনিক শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন; তাঁর অধ্যাপনা শুনে-শুনে বালিকা মুরাসাকি চীনে ভাষায় এতটা দক্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন যে ভ্রাতার ভুল শুধরে না-দিয়ে পারতেন না। তা জানতে পেরে পিতা একদিন বললেন, 'তুই ছেলে হ'লে কতই না গর্ব হ'তো আমার!' মুরাসাকির মন্তব্য: 'পুস্তকপ্রিয় হ'লে পুরুষদের বদনাম হয়, অতএব মেয়েদের পক্ষে তা আরো নিন্দনীয়; আমি যে চীনে পড়তে পারি তা গোপন রাখতে সচেষ্ট হলুম।' লক্ষণীয়, স্ত্রী-পুরুষে এই প্রভেদ সত্ত্বেও মেয়েদের কাব্যচর্চা, নিসর্গচর্চা ও গ্রন্থরচনায় সমাজের সম্মতি ছিলো।

[illegible] কিয়োটো দেখতে আয়োজিত সফরে বেরিয়েছি। বাস্‌-এ আমরা ছাড়া সকলেই শ্বেতাঙ্গ; বেশির ভাগ মার্কিন, দু-এক জনকে ইংরেজ ব'লে বোধ হচ্ছে। জাপানি গাইডটি যুবক, মুখের চেহারা গোলগাল ভালোমানুষ গোছের; তার ইংরেজি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি। অনর্গল ব'লে যাচ্ছে, সেটা এ-দেশের পক্ষে অসাধারণ, হয়তো একই কথা বার-বার ব'লে-ব'লে মুখস্থ হ'য়ে গেছে তার, তবু বলার ধরন ক্লান্তিকর নয়, উচ্চারণও বেশ বোঝা যায়—সেটাও এ-দেশের পক্ষে অসাধারণ। রোমে একজন গাইডের মুখে একবার যে-নমুনা শুনেছিলুম তার তুলনায় এর ইংরেজিকে ভালো বলতেও দ্বিধা হয় না। ভুল

বিশ্বাস হ'লো। মেয়েটির প্রসাধন এমন জোরালো এবং বসনভূষণ এত জটিল ও বিস্তারিত যে দেখতে সে বিপুল হ'য়ে গেছে ; চুলের সঙ্গে অন্য নানা উপাদান মিলিয়ে তার খোঁপার ওজন হয়েছে তিন সের (না কি পাঁচ সের ?) ; তার কিমোনো ও অন্যান্য বসনের স্ফীতি যেমন বিশাল তেমনি বর্ণবিলাসও বিচিত্র ; চূর্ণপ্রলেপে মুখ তার শ্বেত, কালিমাপ্রয়োগে আয়ত তার চোখ—সব মিলিয়ে তাকে স্বাভাবিক মানুষী আর মনে হচ্ছে না, কথাকলি-নর্তকের মতো একেও বাস্তব থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতি মৃদু লয়ে বিরাট একটি পুতুলের মতো ঘুরে-ঘুরে সে দেখালে তার কবরী ও বসনভূষণ, তারপর চা-অনুষ্ঠান ধীরে-ধীরে এগোলো। উনুন ধরানো থেকে আরম্ভ ক'রে বাটিতে-বাটিতে চা ঢালা পর্যন্ত যতগুলি ভিন্ন-ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার প্রত্যেকটি অভিনয় ক'রে দেখালে মেয়েটি ;—নৃত্য নয়, গতি খুব কম, ভঙ্গিসর্বস্ব মূক অভিনয় বলা যেতে পারে। সব সুদ্ধু সময় লাগলো আধ ঘণ্টা।

এর পরে পুরোনো একটি উদ্যানে আমাদের

নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেকালে ছিলো এক রাজন্যের বাগানবাড়ি, বর্তমান নাম শিক্ষাকুঞ্জি বা রৌপ্যশিবির। নানা রঙের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে নকল পাহাড়, সরোবর, অনেক ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতির প্যাগোডা ও মণ্ডপ। জ্যামিতিক নয়, প্রতিসাম্যহীন, সামঞ্জস্য নেই এক অংশের সঙ্গে অন্যের, দীর্ঘিকাগুলিও ঠিক চতুষ্কোণ নয়, নিয়মহীন—জাপানি উদ্যানশিল্পের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই। ধরনটাকে আমরা য়োরোপের ভাষায় রোমান্টিক ব'লে জানি, কিংবা কিছুটা অত্যাধুনিকের আদল আসে মনে হয়— কিন্তু প্রাক্কালীন বিরাট কবরীর মতো জাপানের এটা নিজস্ব ও সনাতন, এবং ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকতার বিপরীত। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে আধুনিক রোমান্টিক শিল্প মর্মাহত হ'য়ে আছে (প্রাচীন 'মেঘদূতে'ও তার আভাস নেই তা নয়); কিন্তু জাপানি উদ্যানশিল্পের সঙ্গেও জেন-স্পৃষ্ট প্রকৃতিপ্রেমের সম্বন্ধ নিবিড়: চন্দ্রোদয়, চেরি-মঞ্জরী, সূর্যাস্ত—এমনি সব নিসর্গশোভা অবলোকনের উপযোগী ক'রে বাগানবাড়ির বিভিন্ন অংশ রচনা করতেন এঁরা

—আর যথাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিতও হতেন। এ-কথা শুনে বিদগ্ধ পাঠকের অধর কুঞ্চিত হ'তে পারে, কেননা আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্যচর্চার আজকের দিনে আর জাত নেই, কিন্তু 'গেঞ্জি-কাহিনী' প'ড়ে প্রতীতি জন্মে যে জাপানি জীবনে একদিন এটা খুবই সত্য ছিলো, আর এ-কথাই বা কেমন ক'রে বলি যে হাল আমলে সেই ধারা একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে? (একটি আধুনিক হাইকুর নমুনা: 'বইছে হাওয়া/তাকে শুধাও গাছ থেকে কোন পাতাটি/খসবে এর পরে।')

একটি প্রাচীরহীন মণ্ডপে আমরা বসেছি, কিছুটা দূর থেকে বাজনা ভেসে আসছে। জলের ধারে ছোটো প্যাগোডা, সেখানে দুটি কিমোনো-পরা তরুণী যন্ত্র নিয়ে আসীন। এঁরা কলেজের ছাত্রী; অনুমান করছি, এই কর্ম এঁদের পক্ষে উপার্জনের উপায়। যন্ত্রের নাম কোটো, এতে অনেকগুলো ক'রে তার থাকে; কিন্তু ধ্বনি কেমন মৃদু ও অনুরণনহীন। খাঁটি জাপানি গান-বাজনায় আমাদের মন সাধারণত সাড়া দেয় না, কিছুটা দুর্বল ও একঘেয়ে ব'লে বোধ হয়; প্রতীচ্য ওজস্বিতাও

নেই ; আবার ভারতীয় বিধুরতারও অভাব। মনে হয় এই সংগীতে এদের নিজেদেরই আর তৃপ্তি হচ্ছে না, তাই এই বিষয়ে এরা আপন ক'রে নিয়েছে য়োরোপকে ; প্রতীচীর সন্তান বা অধিবাসী বা নিকট আত্মীয় নয়, এমন জাত জাপানিরাই একমাত্র, যারা প্রতীচ্য সংগীত-কলায় সুদক্ষ ও সৃষ্টিশীল।

সর্বশেষে অন্য এক গেইশা-ভবন, এটিও খুব পুরোনো বাড়ি, রাত্রেও বোঝা গেলো একটি মনোরম বনস্থলীতে অবস্থিত। গেইশা প্রথা জাপানের একটি সামাজিক কলঙ্ক ব'লে ছেলে-বেলা থেকে শুনে আসছি, এও শুনেছিলাম যে আধুনিক আমলে তার উচ্ছেদ হয়েছে। দুটো কথাই ভিত্তিহীন বা মাত্র অংশত সত্য ব'লে আমার ধারণা হ'লো। নৃত্য গীত অভিনয়ের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করেন এমন মেয়ের কোনো সমাজেই অভাব নেই ; আজকের দিনের গেইশাদেরও তা-ই অবস্থা। এঁদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে, অল্প বয়সে ভর্তি হ'য়ে ললিতকলা শিখতে হয় সেখানে ; য়োরোপের ম্যুজিক হলের নটীদের মতো, এঁদেরও অন্য

পেশা নেবার বা বিবাহ করার স্বাধীনতা অবাধ। জাপানি মেয়েদের মধ্যে এঁরাই এখন একমাত্র, যারা লম্বা চুল রেখে পুরোনো ছাঁদে খোঁপা বাঁধেন ও ঘরে-বাইরে কিমোনো ছাড়া কিছু পরেন না। পুরোনো জাপানের একটি চিত্র-কল্প এঁরা, আর সেদিক থেকে বিদেশীর দ্রষ্টব্য। সেইজন্যে খুব সুখী হ'তে পারলাম না, যখন দেখলাম এই সংস্থার আয়োজন শ্বেতাঙ্গের উদ্দেশেই নিবেদিত।

আমরা সব দেয়াল ঘেঁষে ব'সে গেলুম, তিনটি তরুণী জলযোগ পরিবেষণ করলেন, তারপর মেঝেতে তাদের নৃত্যগীত শুরু হ'লো। চা-অনুষ্ঠানের মহিলাটির মতো আড়ম্বর নেই এঁদের, রীতিমতো স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়—গানের সুরও হালকা ধরনের বিলেতি। শ্বেতাঙ্গের পক্ষে চেনা সুর, কেননা তারা অনেকে আসন ছেড়ে উঠে করতালিসমেত নৃত্যে যোগ দিলেন। একটা ছিলো 'কয়লাখনির গান', তার প্রথম কথাটা বার-বার কানে আসছিলো —'ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্।' প্রতিবেশিনী মার্কিন মহিলাকে আমি জিগেস করলুম, জাপানিতে ঐ

শব্দের অর্থ কী, তা কি দৈবাৎ তাঁর জানা আছে ? তিনি আমাকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ ক'রে জবাব দিলেন, ওটা ইংরেজি শব্দ 'dig', পুরো গানটাই মার্কিনী ও মার্কিনীদের মাতৃভাষায় রচিত। আমি একাধিক কারণে ঈষৎ লজ্জা পেলাম।

১৬ জানুয়ারি

সন্ধ্যায় কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা, তারপর আমাদের বিদায়-ভোজ। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি ভবনে টেবিলে ব'সে প্রতীচ্য ধরনে খাওয়া হ'লো। অনেক মহামহোপাধ্যায় উপস্থিত।

'ভিজিটিং কার্ড' নামক জিনিশটা আমার বরাবর অনর্থক মনে হয়েছে, কেননা বিদেশে

নিয়োগ ভিন্ন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না, আর যাঁদের সঙ্গে নিয়োগ হয় তাঁরা সকলেই আমার নাম ও কিঞ্চিৎ পরিচয় অন্তত জেনেছেন। এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এও জেনেছিলুম যে ঐ শ্বেত ও চতুষ্কোণ নামলিপিকা সঙ্গে না-থাকলেও পাশ্চাত্ত্য দেশে অতিথির স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু এবারে কী মনে ক'রে কিছু কার্ড ছাপিয়ে সঙ্গে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিশ নিয়েছিলুম—কেননা (আগে এটা আমার জানা ছিলো না) জাপান পৃথিবীর একটি দেশ যেখানে পকেট থেকে কার্ড বের করতে না-পারলে বর্বর প্রতিপন্ন হ'তে হয়। কোনো-কোনো বিষয়ে প্রতীচীর চেয়েও কত বেশি পাশ্চাত্ত্য এরা, অথচ সেই সঙ্গে এদের জাপানিত্বও কেমন অক্ষুণ্ণ! এখানে কোনো ভদ্রলোক কার্ড ছাপাতে ও পকেটে নিতে ভোলেন না; একদিকে জাপানি, উল্টো পিঠে রোমান হরফে নাম ছাপানো থাকে তাতে; কারো সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'লে প্রথমে একবার বিনতি করেন, আবার বিনতিসমেত কার্ড এগিয়ে দেন তাঁর হাতে, তিনি প্রতিদান দিলে পুনশ্চ

বিনতির বিনিময়। এবং যে-রকম চিত্রলভাবে জাপানি ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন

করেন, তা হয়তো বুর্বঁ সম্রাটের পারিষদের পক্ষে সম্ভব ছিলো, কিন্তু আজকের দিনে অন্য সকলেরই অসাধ্য। বিশেষত বাঙালিদের আদবকায়দার তেমন কড়াক্কড় নেই; আমার অনবরত মনে হ'তে লাগলো এই অত্যন্ত পরিশীলিত সুধীসমাজে আমাকে না জানি কেমন কদাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু রোমে রোমক হবার উপদেশ শিরোধার্য হ'লেও কোনো মানুষ কি রাতারাতি নিজেকে বদলাতে পারে, না কি সে-রকম চেষ্টা করলেই শোভন হয়?

কিন্তু শুধু শিষ্টাচার নয়, সব দেশেই (হয়তো ক্ষণিক অতিথির পক্ষে ইংলণ্ডে ছাড়া) মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায় ব'লেই ঘর ছেড়ে বেরোনো সার্থক। ভোজের শেষে সেখানেই আমাদের বিদায় দিলে সৌজন্যে কোনো ত্রুটি হ'তো না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এলেন হায়াশি, আর ওসাকার প্রবীণ অধ্যাপক মিয়ামোটো—এঁর সঙ্গে কলকাতায় আমার আগে একবার দেখা

হয়েছিলো। দু-জনেই অনেক দূরে থাকেন, ট্রেনে ফিরতে হবে, বাইরে শীতও তীব্র। তবু শেষ ট্রেনের সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কাটালেন এঁরা। মিয়ামোটো ইংরেজি খুব কম বলেন; বাড়িতে তাঁর পড়ার ঘরে এখনো চেয়ার-টেবিল প্রবেশ করেনি; অধ্যয়ন ও রচনাকর্মের সময় হাঁটু ভেঙে বসা তাঁর অভ্যেস। 'একটু আসছি,' ব'লে এক সময়ে উঠে গেলেন তিনি; ফিরে এলেন প্র. ব.-র জন্য একটি উপহার নিয়ে; হায়াশি-দম্পতির হাত থেকে বন্ধুতার স্মরণিক আমরা আগেই পেয়েছিলুম। সঙ্গে যে-সব ছোটো-ছোটো দিশি জিনিশ ছিলো তা-ই দিয়ে বিনিময় করলুম আমরা। 'আবার আসবেন আপনারা,' 'আপনারা আসবেন কলকাতায়,' 'আবার দেখা হবে।'—এগুলো ইচ্ছা মাত্র, আর মানুষের ইচ্ছার পূরণ অনিশ্চিত; কিন্তু তবু থাকে স্মৃতি—মানুষের সেই এক বান্ধব যা তাকে কখনো ছেড়ে যায় না।

কাল সকালে টোকিওর প্লেন।
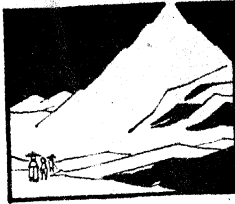
টোকিওতে আমাদের প্রথম দিন কাটলো। বিরাট নগর, পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে বড়ো আজকের দিনে, এক কোটি অধিবাসী নিয়ে ন্যু ইয়র্ক অথবা লণ্ডনকে ছাড়িয়ে গেছে। প্লেনে কিয়োটো থেকে এক ঘণ্টার পথ, তার মধ্যে পনেরো কিংবা কুড়ি মিনিট ধ'রে ফুজিয়ামা আমাদের দৃশ্য হ'য়ে রইলো। পাহাড়টি নিটোল ও ত্রিকোণ, ক্রমশ সরু হ'তে-হ'তে পরিচ্ছন্নভাবে উপর দিকে উঠে গেছে, এই শীতের দিনে প্রায় অর্ধাঙ্গ তার তুষারে মোড়া। জাপানের অন্য সব-কিছুর মতো, এই বিখ্যাত পাহাড়টিও সুমিত ও সুচারু, এর সৌন্দর্য বেশ র'য়ে-স'য়ে ভোগ করা যায়, প্রবল আঘাতে নিশ্বাস কেড়ে নেয় না। রৌদ্রময় দিন ও তুষারময় চূড়া

পরস্পরকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলছে ; উভয় অর্থে দেখতে-দেখতে টোকিও এসে গেলো।

এয়ার-পোর্টে সস্ত্রীক এসেছেন সাবুরো ওটা। ইনিও অধ্যাপক, এবং জাপানি তুলনা-মূলক সাহিত্য-সংস্থার কর্মসচিব। স্বামী-স্ত্রী দু-জনের মুখেই ভাঁজে-ভাঁজে হাসি, দু-জনের হাতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা। এঁদের সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ গাড়িতে চলতে-চলতে টোকিওর বিশাল-তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেলো। পথে পড়লো লৌহনির্মিত টোকিও-স্তম্ভ, ঈফেল-স্তম্ভের চেয়েও এর উচ্চতা বেশি। ইম্পীরিয়াল হোটেলে গাড়ি থামিয়ে আমার মনোমতো সিগারেটের টিন অনেকগুলো কিনে নিলুম : এ-বিষয়ে আমার ব্যাকুলতা দেখে ওটা কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করলেন। আমাকে স্বীকার করতে হ'লো—যা ইতিমধ্যেই আমার ব্যবহার থেকে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন—যে ঐ ক্ষীণ, শুভ্র ও বর্তুল ধূম্রশলাকা ব্যতীত আমার এক দণ্ড চলে না, অথচ আমার কণ্ঠনালী ও ফুশফুশে যে-সব সিগারেট সহ্য হয় তা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড ছাড়া অধিকাংশ দেশেই দুর্লভ। অতএব বিদেশে

৫২ এসে আমার একটি প্রথম কর্তব্য হ'লো—আমার অত্যুমত্ত ধোঁয়ার খোরাক সংগ্রহ করা ; এবং এই কাজটি চুকে যাবার পরে এখন আমি টোকিওর জন্ত কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত।

এক ঘণ্টায় অসংখ্য রাস্তা পেরোবার পর গাড়ি থামলো এশিয়া সেণ্টারের সামনে। এই আবাসটি ওটা আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, আমিও কলকাতায় ব'সে এতে সম্মতি জানিয়েছিলুম। কিন্তু এসে দেখি, বিজ্ঞাপনে ও বাস্তবে বেশি মিল নেই—কিংবা আমারই হয়তো বোঝার ভুল হয়েছিলো। যে-ঘরে নিয়ে গেলো তাতে শয়ন ভিন্ন অন্য কোনো কর্ম অসম্ভব, বাথরুমে শরিক একাধিক, বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে হ'লে জিমনাসটিক্সের কসরৎ ভিন্ন উপায় নেই। দামে শস্তা, আমরাও লক্ষ-পতি নই, কিন্তু সহনীয়রকম আরাম চাই তো। প্র. ব. ও আমি ম্লানভাবে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছি ; এদিকে ওটা তাগাদা দিচ্ছেন এক্ষুনি লাঞ্চ খেয়ে নিতে, নয়তো কাফেটেরিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে। কাফেটেরিয়া শুনে মনটা আরো দ'মে গেলো, ট্রে হস্তে বাঁধা-ধরা সময়ে লাইনে

না-দাঁড়ালে খাবার জুটবে না? আসলে ভবনটি একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস; এবং যদিও আমাকে বিদ্যার্থী বললে ব্যাকরণের ভুল হয় না, এবং আমার হৃদয় এখনো তারুণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ব'লে আমি দাবি ক'রে থাকি, তবু এক দল সচল, সশব্দ ও অত্যুৎসাহী যুবক-যুবতীর সংসর্গে এক অপরিসর স্বল্পাসবাব ঘরের মধ্যে সপ্তাহকাল যাপন করার প্রস্তাবটিকে কোনো-রকমেই মনোরম ব'লে মানতে পারলুম না। কিন্তু আমরা এখানে থাকতে না-চাইলে ওটা যদি কিছু মনে করেন? বা তাঁকে বিব্রত করা হয়?—নাঃ, এ-সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জাটা কিছু কাজের নয়, তাঁকে খোলাখুলি মনের কথা বলাই ভালো। মনস্থির ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি, ওটা-দম্পতি লাঞ্চের মধ্য-পথে; আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে তাঁরা যে নিজেরা অভুক্ত থাকলেন না, এতেও প্রমাণ পেলুম জাপানিদের সংসার-যাত্রা কত গভীরভাবে পশ্চিমধর্মী—বা আসলে হয়তো এই বাস্তবনিষ্ঠা তাঁদের নিজেদেরই স্বভাবসিদ্ধ। আমাদের আবেদন শুনে ওটার কোনো ভাবান্তর হ'লো না; খাওয়া শেষ ক'রে

ছিপছিপে শরীরে কর্মঠভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর তৃতীয় বা চতুর্থ টেলিফোন সফল হ'লো, আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে বদলি হলুম গিন্‌জা টোকিও হোটেলে। তারপর চা, স্যাণ্ডুইচ, আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচির আলোচনা; এমনকি, কিছুটা হাস্যপরিহাস। 'এমনকি' বলছি এইজন্যে যে হাস্যপরিহাসের জন্য অনেকখানি ভাষার প্রয়োজন হয়, এবং ওটার ইংরেজি বেশ শড়োগড়ো। সন্দেহ নেই, এ-বিষয়ে তিনি জাপানিদের মধ্যে অসামান্য ব্যতিক্রম।

হোটেলের সামনেই গিন্‌জা স্ট্রীট, শহরের বড়ো-বড়ো দোকানপাট সব এই রাস্তায়। সন্ধেবেলা সেদিকে আমাদের অভিযান হ'লো। প্রশস্ত পথ, বিপুল জনতা, অসংখ্য যান, অন্তহীন নিয়ন-চিহ্ন, প্রকাণ্ড সুশৃঙ্খল শব্দহীন ব্যস্ততা। কাউকে চোখ বেঁধে এনে ছেড়ে দিলে তার হঠাৎ মনে হবে কোনো মার্কিনী শহর। সবুজ সংকেতে রাস্তা পেরোবার ভিড় দেখলে মধ্যনাগরিক মানহাটানের কথাই মনে পড়ে। আর বিভাগীয় বিপণিগুলি—আয়তনে ও ঐশ্বর্যে গিম্বেলস মেসির সমান না হোক, আকর্ষণে কারো

চাইতেই কম যায় না। পণ্যবস্তু বহু ও বিচিত্র, সজ্জা নয়নহরণ, ব্যবস্থাপনা অনিন্দ্য। সব দেশেই, বেচা হ'য়ে গেলে, জিনিশটাকে কোনো বাক্সে বা ঠোঙায় পুরে ক্রেতার হাতে দেয়া হয়, আর সেই আধারগুলোকে সুদৃশ্য ও সুবহ করতেও সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু এই গৌণ ব্যবসায়িক বিষয়টিকে জাপানিরা যে-রকম একটি গৌণ ললিতকলায় পরিণত করেছে, সে-রকম অন্য কেউ পারেনি, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব ব'লেও আমার মনে হয় না। আছে একটি সূক্ষ্ম জাপানি স্পর্শ, তা বিশ্লেষণের অতীত, বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো যায় না, কিন্তু চলতে-ফিরতে সমস্ত ব্যাপারেই তা ধরা পড়ে। এখানে অনেক কিছুরই বাইরের চেহারা আমেরিকার মতো, এশিয়ার অন্য কোনো-কোনো দেশেও এখন এই ভাবটি দেখা দিচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে মনে হয় যে যথেষ্ট আমেরিকার মতো হচ্ছে না, আর জাপানে এলে দেখা যায় যে মার্কিনী ধরনের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করা হয়েছে, যা খাশ মার্কিনীর পক্ষেও নতুন ও উপাদেয়।

ফেরার পথে ফুটপাতে একটি অন্ধ ভিখিরি দেখলাম। পাশে ভিক্ষাপাত্র, গায়ে শীতবস্ত্র নেহাৎ কম নেই, পিছনে এক ভক্ত কুকুর অটল-ভাবে আসীন। কুকুরটির চোখে করুণা, মাঝে-মাঝে সামনের পা তুলে সে এমনভাবে আবেদন জানাচ্ছে যে কিছু দেবার লোভ সংবরণ করা প্রায় অসম্ভব। পশুটির, এবং তার প্রভুর, দু-জনেরই বেশ পুষ্ট চেহারা, উপবাসজনিত কার্শ্যের কোনো লক্ষণ নেই। আবার আমার মার্কিন-দেশ মনে পড়লো। এক বরফ-পড়া সন্ধেবেলা ন্যু ইয়র্কের সেভেন্থ এভিনিউতে একটি ভিখিরি দেখেছিলাম; কলকাতার পুলিশম্যানদের মতো একটা আঁটো কাঠের ঘরের মধ্যে সে ঢুকে আছে, যখন চলে ঐ ঘরটাকে ঘাড়ে নিয়েই চলে, ওভারকোট টুপি ইত্যাদির দ্বারা সে এমনভাবে আচ্ছাদিত যে চোখ দুটি ছাড়া তার মুখের প্রায় কিছুই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখলে দৈত্য-দানব ব'লে ভুল হয়। শীতের দেশে ভিক্ষে করতে হ'লেও অন্ততপক্ষে জামা-জুতো যথেষ্ট চাই।

কপালগুণে এই হোটেলটা চমৎকার। আইনমাফিক পয়লা-নম্বরি নয়, মার্কিনী তিন-তারার পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু হয়তো সেইজন্যেই বেশি উপভোগ্য। আড়ম্বর অফুরন্তভাবে বাড়িয়ে চলা যায়, কিন্তু অচিরস্থায়ী অতিথির আরাম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এর চেয়ে বেশি ব্যবস্থা আর কী হ'তে পারে, তা ভেবে পাওয়া শক্ত। সামনের কাচের দরজাটি দুই পাল্লার; ঢোকার ও বেরোবার সময় কাছে আসামাত্র নিজে-নিজেই খুলে যায়। প্রশস্ত লাউঞ্জ; কেরানি ও পরিচারকেরা সংখ্যায় যেমন বেশি, মনোযোগেও তেমনি অক্লান্ত; যে-কোনো কাজ সম্পন্ন হ'তে দু-এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

হোটেলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের চারটি ভোজনালয় ; তার মধ্যে যেটি উপাহারের

জোগানদার সেটি দিনে-রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। বেসমেণ্টে সারি-সারি দোকান, আধ ঘণ্টা খুচরো সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটি বেশ। আমাদের ঘরে আছে বিশ্রামের সোফা, লেখার টেবিল, দেরাজে চার-পাঁচরকম চিঠির কাগজ, রাত্রে শুয়ে বই পড়ার জন্য যে-বাতি দিয়েছে তা অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল এই তিন রকম শক্তি ধারণ করে। বাথরুমের সাজ-সরঞ্জাম প্রায় বিলাসিতার পর্দায় বাঁধা, শয্যা-রচনা মনোরম, নবনীপেলব কম্বলটির উষ্ণতা, কেন্দ্রীয় তাপের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, রাত্রে আমাদের গ্রীষ্মমণ্ডলে বদলি ক'রে দেয়। কাপড়ের আলমারিতে কিমোনো ও স্নুতির চটি রাখা আছে ; ভোরবেলা চায়ের ট্রেতে খবর-কাগজ দিয়ে যায়, আর দেয়, সাবান তোয়ালে ইত্যাদির মতো, প্রত্যহ নতুন কয়েকটি দেশলাই। ও-রকম সুন্দর দেশলাইও আর-কোনো দেশে আমি দেখিনি—কাজে অমন মজবুত, আর দেখতে অমন অসাধারণ ভালো।

হোটেলের লিফট চালায় মেয়েরা। বড়ো লিফট, ভিতরে রেডিও চলছে, তার আলো নয়নাভিরাম এবং চালিকারাও তা-ই। দিনের মধ্যে তিনবার সাজ-বদল করে এরা : সকালে দুপুরে আলাদা রঙের স্কার্ট, সন্ধ্যায় পরে কিমোনো। এদের কপোল অরুণবর্ণ, চোখ-মুখ অহরহ সহাস্য, একই লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার ওঠা-নামা করলেও বিরক্তির রেখামাত্র পড়ে না, ধন্যবাদ জানালে পাৎলা লাল ঠোঁট খুলে উজ্জ্বল দাঁতে পাখির মতো গলায় বলে, 'You are welcome.' লিফটগুলো স্বতশ্চল, অর্থাৎ চালক অপরিহার্য নয়, এই মেয়েদের আসল কাজ হয়তো শোভাবর্ধন, এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে মানতেই হবে যে এই উদ্দেশ্য এরা প্রভূতভাবে সার্থক করেছে। ব্যাবসাদারি? হ্যাঁ—হয়তো—নিশ্চয়ই—কিন্তু আর কোন দেশে ব্যাবসাদারি এমন মনোমুগ্ধকর?

একবার 'কুইন মেরি' জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলাম। কাকে বলে বিলাসিতা, 'রাজার হাল' কথাটার অর্থ কী, সেই পাঁচ দিনে সে-বিষয়ে কিছু ধারণা হয়েছিলো। সকালে

চোখ মেলার মুহূর্ত থেকে রাত্রে ঘুমের সময় পর্যন্ত অফুরান সেবা ও সম্ভোগের ব্যবস্থা প্রতিটি ঘণ্টাকে চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছে। পান-ভোজনের আয়োজন এমন বিপুল যে মনে হয় কোনো পুরাণকাহিনী বাস্তব হ'য়ে উঠলো। ভোজনশালার কাচের দরজা খুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দুটি রাফায়েলের দেবদূত, আর ভিতরে এক রূবেন্সীয় জগৎ ঐশ্বর্যে ও ইন্দ্রিয়-বিলাসে উদ্বেল। ঘন গালিচা; শিল্পিত দেয়াল ও সীলিং; স্ফটিক, ধাতু ও মোমগাত্র কাষ্ঠফলকে বিচ্ছুরিত বৈদ্যুৎ; কান্তিমান চিক্কণ পরিচারকবৃন্দ; আপাতসুখী, আপাত-সুস্থ, আলাপোৎসুক নরনারীর দল: এই হ'লো পটভূমিকা। আর উপচার? তাকে অন্তহীন বললে বেশি বলা হয় না; অন্ততপক্ষে মর্তপ্রকৃতির কোনো সৃষ্টি বাদ পড়েনি। পশু, পাখি, অণ্ড ও জলজ প্রাণী; শাক, শস্য, দুগ্ধদ্রব্য; পঞ্চাশ রকম 'অর্দভ' বা 'সৃষ্টিছাড়া' ছোটো-ছোটো খাবার; পঞ্চাশ রকম সূপ ও পনির; অতিকায় আঙুর, আপেল ও হেমন্তের অন্য সব দান; যেন স্বর্গের চাবি কোমরে ঝুলিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে গম্ভীরদর্শন মদিরারক্ষী : উচ্ছল পাত্র ; নীল আগুনে সুবাসিক্ত মাংস ; আসব-রক্তিম মিষ্টান্ন ; কফির ঘ্রাণ ; সিগারেটের ধোঁয়া :— রূপে, রসে, তাপে, সৌগন্ধ্যে বিশাল কক্ষটি যেন বাষ্পাকুল হ'য়ে আছে। এক-একবার আহার শেষ ক'রে আপনি ডেক-এ গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন, তক্ষুনি কোনো পরিচারক ছুটে এসে আপনার গায়ে কম্বল বিছিয়ে দিলে, পায়ের সামনে এগিয়ে দিলে চৌকি ; আরামে হয়তো তন্দ্রা এসেছে আপনার, কিন্তু একটু পরেই সামনে নিয়ে এলো 'বীফ-টী' বা গোমাংসরস, অথবা বৈকালিক চা। প্রকাণ্ড জাহাজের মধ্যে যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই প্রাচুর্য ও বিলাসিতা, সেখানেই ভোগের আমন্ত্রণ অবারিত। কিন্তু আপনি যেহেতু ইন্দ্র অথবা জুপিটার নন, একজন মানুষ-মাত্র, এবং মানুষের শক্তি ও সময় যেহেতু শোচনীয়রূপে সীমিত, সেইজন্য এই প্রাচুর্যই অবসাদের জন্ম দেয়, নিঃশ্রম নিশ্চিন্ত দিন-গুলিতে যেন মূঢ়তার প্রচ্ছদ নেমে আসে। আপনাকে তাই খুঁজে-খুঁজে বের করতে হয়

কোথায় আছে একটু নির্জনতা, যেখানে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বড়ো-বড়ো পাগল ঢেউগুলির উপর দিয়ে আপনি আপনার মনকে মেলে দিতে পারেন, বা দেখতে পান বিকেলের আলোয় রূপবান নাবিক যুবাদের অবসর-যাপনের হিল্লোল; বা সূর্যাস্তের সময় পিছন দিকের ছোটো খোলা ডেকটিতে শক্ত ক'রে থাম আঁকড়ে দাঁড়াতে হয়, পাছে দারুণ হাওয়া উড়িয়ে ফেলে দেয় আপনাকে; বা বেশি রাত্রে পানশালা নৃত্যশালা এড়িয়ে উঠে আসতে হয় একেবারে উপরকার ডেক-এ, যেখানে নেই মানুষ, আছে আকাশ, আর অন্ধকারে দিকদিগন্ত আবৃত, আর মাস্তুলের আলোতে আর তারাতে মিলে যেন কোন অনন্তকে মূর্ত ক'রে তুলছে, আর যেখানে বাতাসের ও সমুদ্রের গর্জনে আবার আপনি শুনতে পাবেন আপনার হৃদয়ের ক্রন্দন—সেই গোপন, সেই দুর্বোধ ভাষা, যা অকথ্য এবং অসহ্য হ'তো যদি না শুধু কবিতা থাকতো আমাদের স্মরণে ও সম্ভাবনায়।

কিন্তু আমাদের এই হোটেলটি কোথাও মরত্বের সীমা লঙ্ঘন করেনি; যা-কিছু থাকলে

সুখ হয় তা সবই আছে, কিন্তু কোনো বিষয়ে আতিশয্য নেই ব'লে উপভোগের স্পৃহা অথবা শক্তি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে না। তাছাড়া বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যাপারে টোকিও আমাকে বেশ খানিকটা খাটিয়েও নিচ্ছে, এবং পরিশ্রমের পরে এলেই সুখ সুস্বাদু।

অন্য একটা কারণে জাপান খুব আরামপ্রদ। সারা দেশটা পারিতোষিকের উৎপাতরহিত; হোটেলের বিল-এর মধ্যে যেটুকু ধ'রে নেয় তার উপরে এক ইয়েনও কারো প্রত্যাশা নেই। প্রতীচীর সঙ্গে তুলনায় এবং প্রতিতুলনায় অনেক ক্ষেত্রে জাপান নিশ্চয়ই জিতে যাবে।*

---

* কয়েকদিন পরে সান ফ্রানসিস্কোতে আমরা যে-হোটেলে উঠলাম তার নাম মার্ক হপকিন্স; আগে জানতুম না হোটেলটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। সেখানে আমাদের জানলার বাইরে ছিলো উপসাগর, পুলের উপর দিবারাত্রি স্রোতের মতো মোটরগাড়ি; ঘরের মধ্যেও অভাব কিছু ছিলো না। ভালো নিশ্চয়ই; কিন্তু বলতেই হবে যে গিন্‌জা টোকিও-র মতো সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে পাইনি, যদিও মূল্য দিতে হয়েছে তিনগুণেরও বেশি। জাপানি জিনিশপত্রও দামে শস্তা,

আমাদের আজকের দিনটা টোকিওর বাইরে কাটবে; ওটা আমাদের সঙ্গী।

দৈনিক যাত্রীতে বোঝাই ট্রেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চলেছি। কেজো সকালবেলা এখন; টোকিও আর য়োকোহামার মধ্যে দুই দিকে মিনিটে-মিনিটে ট্রেন ছুটছে; বিশ শতকের সমস্ত উদ্যম ও উপায়নৈপুণ্য এই দুই নগরকে মিলিয়ে দিয়ে প্রখর স্রোতে প্রবাহিত। ভিড়ের

কিন্তু গুণপনায় অত্যুৎকৃষ্ট। আমি ধনবিজ্ঞানী নই, কেমন ক'রে জাপানিরা এই অসাধ্যসাধন করে বলতে পারবো না; অনুমান করি এর একটা কারণ এই যে মজুরির হার জাপানে তেমন উঁচু নয়। কিন্তু গুণের সঙ্গে কম-দামের এই সমন্বয় পশ্চিম জর্মানিতেও লক্ষ করেছি।

ধরনটা প্রতীচ্য ; কেউ কথা বলছে না, প্রায় সকলের চোখই খবরকাগজে নামানো, স্টেশনে-স্টেশনে নামা-ওঠার কাজটি নিঃশব্দে ও দ্রুতবেগে সম্পন্ন হচ্ছে। য়োকোহামা পেরিয়ে আমাদের অন্য একটা ট্রেনে উঠতে হ'লো ; সেটা একেবারে ফাঁকা, বড়ো কোনো কর্মস্থলে যাচ্ছে না, বোঝা যায়। চোখে পড়লো কামরার প্রসাধন, আসনের গদির রংটি গাঢ় নীল, হাতের কাছে ছাইদান আছে, মেঝে, জানলা, জানলার কাচ —সব ঝকঝকে পরিষ্কার। পরিচ্ছন্নতার কোনো প্রতিযোগিতা হ'লে পৃথিবীর মধ্যে জাপানের জয় অনিবার্য।

যে-স্টেশনে নামলুম তার নাম মাচিদা-সিটি। ('City' শব্দের মার্কিনী অর্থ জাপানিরা মেনে নিয়েছে, দেখছি ; যে-কোনো ছোটো শহর বা বড়ো গ্রামকে ঐ আখ্যা দিতে এদের বাধে না।) কাছেই টামাগাওয়া গাকোয়েন ; 'গাকোয়েন' শব্দের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিদ্যায়তনটির সুখ্যাতি দেশে থাকতেই শুনেছিলুম। এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কুনিয়োশি ওবারা ; জনশ্রুতি থেকে মনে হয়েছে যে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আদর্শ

কিছুটা রবীন্দ্রনাথের মতো ; শহরের বাইরে, 'প্রকৃতির বক্ষে' এই জাপানি আশ্রমের চেহারাটা চোখে দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিলো।

ওবারা গাড়ি পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য, পাঁচ মিনিটে বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। কাছিমের পিঠের মতো একটি পাহাড়, তার ধাপে-ধাপে বিদ্যালয়টি ছড়ানো। পাহাড়ের মধ্যপথে গাড়ি থামলো, গাছপালা নিবিড় সেখানে, চূড়ায় দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের চ্যাপেল—বা শান্তি-নিকেতনের ভাষায়—মন্দির। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওবারা-পত্নী দাঁড়িয়ে আছেন ; তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় ক'রে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে উপস্থিত হলুম। প্রটেস্টান্ট গির্জের মতো কক্ষটি, সেই রকমই ঠাণ্ডা। দুই সারিতে আলাদা হ'য়ে বসেছে য়ুনিফর্ম-পরা ছাত্র-ছাত্রীরা, তাদের বয়স আট-দশ থেকে পনেরো-ষোলোর মধ্যে ; তাদের উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি থেকেই বোঝা গেলো তারা শৃঙ্খলায় অত্যন্ত বেশি অভ্যস্ত। বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি বাইবেল থেকে উপদেশ শোনাচ্ছেন, দৃষ্টিপাত-মাত্র বুঝতে পারলুম, ইনিই ওবারা। বৃদ্ধ,

কিন্তু চেহারা যুবকের মতো সতেজ; পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ-কামানো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; একমাথা রুপোলি চুলের তলায় মুখখানা সুগোল, স্নিগ্ধ ও গোলাপি রঙের; সব মিলিয়ে ও-রকম একটি সুদর্শন পুরুষ যে-কোনো দেশেই বিরল। বাইবেল থেকে নীতিশিক্ষাদান শেষ ক'রে তিনি আমাদের বিষয়ে ও উদ্দেশে দু-চার কথা বললেন; ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভুল সুরে 'জনগণমন' গাইলে, তারপর আমাকে অল্প কিছু বলতে হ'লো, প্র. ব. শোনালেন কয়েক পংক্তি রবীন্দ্রসংগীত। দেশপ্রেম বা রবীন্দ্র-ভক্তি কোনোটাই আমার পেশা নয়, কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানি ছেলে-মেয়েদের মুখে 'জনগণমন' গান শুনে আমি ঈষৎ বিচলিত না-হ'য়ে পারলুম না—তার কারণ বোধহয় ভারতবর্ষ যতটা, তার চেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথ।

লাঞ্চের আগে ও পরে, ওবারার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বিদ্যালয় দেখলুম। দিনটা কনকনে ঠাণ্ডা; তার উপরে, কী কারণে জানতে পারিনি, ওবারা তাঁর আশ্রমের মধ্যে টুপি পরা নিষিদ্ধ

ক'রে দিয়েছেন। আমি তাই যখনই যে-ঘরে ঢুকছি, প্রথমেই খানিক দাঁড়িয়ে নিচ্ছি চুল্লির ধারে, চেষ্টা করছি অন্তত পক্ষে হাত দুটোকে তাতিয়ে নিতে। আমরা যাকে লেখাপড়া বলি, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা তাতে আবদ্ধ নয়; আছে নানা রকম হাতের কাজ ও যন্ত্র-বিদ্যা, সব্জিখেত, মাছের পুকুরও বাদ পড়েনি, কাচের ঘরে উত্তাপে লালিত হচ্ছে বিরল ও মূল্যবান গাছপালা। কলাভবন ও চিত্রশালাটি রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ব'লে বোধ হ'লো। ছাত্রদের ছবি দেখেও বোঝা যায় যে জাপানি চিত্রকলার ঐতিহ্যে কখনো ভাঙন ধরেনি, বা এখানে 'ঐতিহ্য' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়নি 'অচলায়তন'—নিজেদের উপর আস্থা রাখে ব'লেই এরা জগতের দিকে সবগুলো দরজা-জানলা খুলে রেখেছে। জাপানের অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো, এখানেও ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক, শেখানো হয় অত্যাধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে। ক্লাশে শিক্ষয়িত্রী একজন থাকেন বটে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের আসল কাজ হ'লো কানে যন্ত্র লাগিয়ে রেকর্ড শোনা। কয়েক

মিনিট আমিও কান পাতলুম তাতে; ধীরে-ধীরে, স্পষ্ট ক'রে, মার্কিনী উচ্চারণে বলা হচ্ছে: 'Mary, Mary, get up from bed. It is time to go to school.' একই কথা আটবার, দশবার ক'রে বলা হচ্ছে, যাতে শিশুদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। শুধু যদি বলতে শেখানো উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে এই উপায় নিশ্চয়ই প্রশস্ত; কিন্তু অনুমান করছি এটা জাপানে সম্প্রতি আমদানি হয়েছে, কেননা যাঁদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করছি তাঁরা অনেকে পণ্ডিত হ'লেও নামমাত্র ইংরেজি বলেন। স্বয়ং ওবারা তাঁদেরই একজন।

একটি পঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'লো: সে কোনো-একটা ফলিত বিজ্ঞান শিখছে এখানে, সামনের বছর দেশে ফিরে যাবে। জাপানি ভাষা বেশ রপ্ত হ'য়ে গেছে ছেলেটির, তা না-হ'লে এ-দেশে কিছুই শেখা যায় না। শুনলুম, প্রতি বছর একটি ক'রে বিদেশী ছাত্রের পড়া-খরচ অন্যান্য ছেলেমেয়েরা চাঁদা ক'রে জুগিয়ে দেয়, য়োরোপের অভি-

দূরবর্তী দেশ থেকেও মাঝে-মাঝে ছাত্র আসে এখানে, নানা দেশের সঙ্গে যোগস্থাপনে এঁরা নিত্যসচেষ্ট। যাকে বলে মানবিক বিদ্যা, এই প্রতিষ্ঠানের ঝোঁকটি ঠিক সেদিকে নয়; 'skills and technics' শিখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংসারের জন্য সক্ষম ক'রে তুলছেন এঁরা; ব্যায়াম তাই আবশ্যিক, ঘর পরিষ্কার, বিছানা-পাতা ইত্যাদি কাজ নিজেদেরই করতে হয়; প্রয়োজনমতো সমাজসেবাতেও ডাক পড়ে। আমি বালক বয়সে এ-রকম বিদ্যালয়ের ছাত্র হ'লে সুখী হ'তে পারতুম না; কিন্তু পঞ্চাশ পেরিয়ে বেড়াতে এসে বেশ ভালো লাগছে।

একটা জিনিশ আমার কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেলো: প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় কেন। ছাত্রছাত্রী অধিকাংশই নাবালক, এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতেও তেমন ব্যাপ্তি নেই; আমাদের হিশেবে এটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট মহাবিদ্যালয়। কিন্তু জাপানে শিক্ষায়তনের পরিভাষা বোধহয় অন্য রকম; কেননা এক টোকিওতেই, শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় আছে পঞ্চাশটি, যা পৃথিবীর অন্য যে-কোনো নগরের

পক্ষে কল্পনাতীত। এমন কি হ'তে পারে না যে অন্যান্য দেশে যাকে 'স্কুল' বা 'কলেজ' বলে, এখানে সেগুলোই আকারে বড়ো হ'লে বিশ্ব- বিদ্যালয় ব'লে গণ্য হয়? খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি, মনে হয় ব্যাপারটা তা-ই।

অপরাহ্ণে ওবারার বাসভবনে একটু বিশ্রাম। ঠাণ্ডায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর চুল্লির ধারে বসতে পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করলুম, এবং আমাদের পক্ষে সেই মুহূর্তে যার মতো বাঞ্ছিত জিনিশ আর-কিছু ছিলো না, সেই 'কালো' বা ভারতীয় চা পরিবেষণে শ্রীমতী ওবারার তৎপরতা আমাদের মুগ্ধ করলে। তাঁর কাছে, অন্যান্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা চায়ের পরে গাড়িতে উঠলুম। ওবারা আমাদের সঙ্গে চলেছেন, তিনিই নিমন্ত্রণকর্তা, আমাদের রাত্রিবাস হবে হাকোনেতে।

চলেছি গ্রামের মধ্য দিয়ে, কিন্তু 'গ্রাম' বলতে আমাদের ভারতীয় মনে যে-ছবি জেগে ওঠে তার সঙ্গে এর কিছুই মেলে না। নেই উদার আকাশ অথবা সীমাহীন প্রান্তর; পাহাড়ি

দেশ শীতে ঘনিষ্ঠ; নিসর্গ, কৃষকদের কুটির, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো শহরে কাচের দরজাওলা দোকান—সব-কিছুই প্রতীচীর সঙ্গে সুরে বাঁধা। যে-পথ দিয়ে চলেছি তা গেছে টোকিও থেকে কিয়োটো পর্যন্ত; পুরোনো এবং ঐতিহাসিক পথ এটি, ছবিতে ও কবিতায় বিখ্যাত, পূর্বযুগে যাত্রীরা যাতায়াত করেছে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে। তখন এর নাম ছিলো টোকাইডো—যার অর্থ 'পূর্বসাগরের মুখোমুখি পথ'; এক-এক দিনের ভ্রমণের ব্যবধানে তিপ্পান্নটি বিশ্রামস্থল গ'ড়ে উঠেছিলো —পাহাড়ের কোলে, হ্রদের তীরে, পাইন-বনের শান্ত নির্জনতায়। অনেকবার মোড় নিতে-নিতে আমাদের সামনেও খুলে গেলো সেই 'পূর্বসাগর' —সন্ধ্যার ছায়ায় ইস্পাত-রঙের প্যাসিফিক; তার ধার দিয়ে একটি রেলগাড়িকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলুম। আমাদের মোটর-গাড়িও উপকূল ঘেঁষে চললো খানিকক্ষণ, নামলো রাত্রি, ধীরে এগিয়ে এলো পথের দু-ধারে আলো-জ্বলা বাড়ি আর দোকান;— এই জায়গাটাই হাকোনে।

দোতলা একটি কাঠের বাড়ির সামনে আমরা নেমেছি। তক্ষুনি সামনের ঠেলা দরজা খুলে গেলো, একটি ছিপছিপে যুবক বেরিয়ে এসে নতজানু হ'য়ে অভিবাদন করলেন। ওবারার প্রাক্তন ছাত্র ইনি, এই সরাইখানার মালিক; বোঝা গেলো, ওবারা আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন, আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। আমরা ভিতরে যেতেই একটি দাসী এগিয়ে এসে নতজানু হ'লো আমাদের জুতো খুলে নেবার জন্য, যথারীতি কাপড়ের চটি প'রে আমরা দোতলায় এলাম। বলতে পারবো না সিঁড়িটি কী সুন্দর ও নির্মল, ঘরটি কী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তা বলা যাবে না। আভরণ স্বল্প, সেই স্বল্পতাই সবচেয়ে বড়ো আভরণ। জাপান বিষয়ে ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু শুনে আসছি, যা-কিছু পড়েছি, কল্পনা করেছি বা ছবিতে দেখেছি, ঐ ঘরটিতে ঢোকামাত্র হঠাৎ সব প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠলো, যেন জাপানের অন্তরাত্মার একটি রূপ দেখতে পেলাম। মাদুরে মোড়া মেঝে, অর্ধেক মাদুরে মোড়া দেয়াল, দেয়ালের ও সীলিঙের কাঠে অল্প কারুকার্য,

বসবার ব্যবস্থা মেঝেতে। পাশে ছোটো শোবার ঘর, পিছন দিকের লম্বা বারান্দায় হালকা চেয়ার অপেক্ষা করছে, তার ভোক্তা হবার ইচ্ছে থাকলেও এই শীতের রাত্রে কারোরই সাধ্য নেই। বারান্দার তলা দিয়ে, পাথরে-পাথরে প্রতিহত হ'য়ে, চ্ছলচ্ছল শব্দে ব'য়ে চলেছে ক্ষীণকায় গিরিস্রোতস্বিনী, তার ওপারে গাছপালার অন্ধকার। ঘরের মধ্যে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার মনে হ'লো যে শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বাড়িগুলোতে সাজ-সজ্জার যে-বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম তার ধরনধারন কিছুটা জাপানি।

ফুজিয়ামা কাছেই। এখন আর অগ্নি-উদ্‌গিরণ নেই তার, শুধু জ্বালাময় স্মৃতি উপকারী উষ্ণ প্রস্রবণে নিহিত হ'য়ে এই অঞ্চলে প্রচুর-ভাবে ছড়িয়ে আছে। যাঁরা বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যের সন্ধানী, এবং যাঁরা দৃশ্যের প্রেমিক, তাঁদের সকলের পক্ষেই হাকোনে একটি পীঠস্থান। আমাদের সরাইখানার তলাতেই একটি প্রস্রবণ লুকোনো। লুকোনো বলছি এইজন্যে যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই; নৈসর্গিক

তপ্ত জলকে অনেকগুলো ছোটো-ছোটো কুঠুরির মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার একটাতে ঈষৎ শঙ্কিত চিত্তে নাইতে ঢুকলুম। বাষ্পে ঘন হ'য়ে আছে কুঠুরিটা, চোখে ভালো দেখা যায় না প্রথমে, একটা চৌবাচ্চার মধ্যে অনবরত সধূম জল প্রবেশ করছে, আর-এক পাশে টবে রাখা আছে ঠাণ্ডা জল। যদিও সব রকম ব্যবস্থাই ছিলো, আমি পায়ের মোজা ভিজিয়ে-টিজিয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে অচিরেই ঘরে ফিরে এলুম ; কিন্তু এটা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হ'লো না যে যারা হাত-পা ব্যবহারে আমার চেয়ে পটু, তারা এখানে স্নান ক'রে অগাধ আরাম পাবেন। বন্ধু ওটাকেই দেখলুম নগ্ন গাত্রের উপর কিমোনো জড়িয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত মুখে বেরিয়ে আসছেন।

এবার মেঝেতে ব'সে জাপানি ধরনে সান্ধ্য-ভোজ। নিচু, চৌকো টেবিলের চারদিকে চারজনে বসেছি, সকলের গায়েই সরাইখানার দেয়া কিমোনো। সুকোমল আসন, চেয়ারের মতো হেলান দেবারও ব্যবস্থা আছে। টেবিলের তলার দিকটায় কম্বল বিছোনো, সেই কম্বলের

ভিতর দিয়ে পা গলিয়ে দেয়ামাত্র নিচে অতি সুখপ্রদ তাপ অনুভূত হ'লো। মেঝের তক্তা সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানে, তলায় তাপপাত্র জ্বলছে; যদি আমরা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতুম, আর টেবিলের তলায় থাকতো অগ্নিকুণ্ড, তাহ'লে যা হ'তো তার চেয়ে আরাম কিছুমাত্র কম মনে হ'লো না। পায়ের তলায় তাপ, পাশে তাপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে, হাঁটুর উপরে কম্বল, কণ্ঠনলীতে উষ্ণ সাকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে —সারাদিন পরে এতক্ষণে সত্যি-সত্যি শীত ভাঙানো গেলো। ওবারার গোলাপি রঙের মুখটি হাসিতে ও সরলতায় উদ্ভাসিত, আমাদের সুখী হ'তে দেখে আনন্দিত তিনি, আমরা যা-কিছু বলি তার ভাষা না-বুঝেই সারা মুখে প্রীত হ'য়ে ওঠেন, ওটা কথাটা বুঝিয়ে দিলে পরে তার যথাযোগ্য উত্তর দেয় আবার তাঁর অনাবিল হাসি ও চোখের উজ্জ্বলতা। এমনি বিকশিত মনে, মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিয়ে, কৌতুক ও প্রীতি-বিনিময়ের ফাঁকে-ফাঁকে, আমরা পাচকের প্রতি সুবিচার করতে লাগলুম;—এক ঘণ্টার আগে ভোজন শেষ

হ'লো না। শুতে গিয়ে দেখি, রেশমের লেপের তলায় বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র দিয়েছে; ঘর অন্ধকার ক'রে দেয়ামাত্র শিয়রে নদীর কলতান ধ্বনিত হ'লো। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে— ঘুমিয়ে পড়লুম বলতে পারলেই শোভন হ'তো, কিন্তু জানি না কেন, হয়তো ঘরে অত্যধিক তাপের জন্যই, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না।

* * *

মনে পড়লো আর-এক দিনের কথা। এই প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে ক্যালিফর্নিয়া, সেখানে আমি দু-এক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ। ঘুরতে-ঘুরতে উপস্থিত হয়েছি বিগ স্যুর-এ, হেনরি মিলারের আমন্ত্রণে। সান ফ্রানসিস্কো ও লস এঞ্জেলেস-এর মধ্যবর্তী এই 'বড়ো দক্ষিণ'; মন্টেরে এয়ারপোর্ট থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে এর সীমানা আরম্ভ। যেমন ডি. এইচ. লরেন্সের স্মৃতিজড়িত নিউ মেক্সিকো, তেমনি এই অঞ্চলও এমন অনেকের বাসভূমি যাঁরা লেখক অথবা চিত্রকর, কিংবা যাঁরা

শিল্পকলার প্রেমিক, বা অন্য কোনো কারণে সমাজে খাপছাড়া। তার একটা কারণ, এ-সব পাড়ায় প্রকৃতি এখনো কিছু পরিমাণে বন্য ; আর-এক কারণ পূর্বতটের বা যে-কোনো নগরের তুলনায় খরচ অনেক কম এখানে।

কয়েকদিন আগে ক্ষণিকের জন্য নিউ মেক্সিকোতেও থেমেছিলাম। শুকনো হাওয়া লাল মাটির দেশ : পথে যেতে-যেতে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ মনে পড়ে। আলবাকার্কে থেকে বাস্-এ ক'রে টাওস-এ যখন পৌঁছলাম তখন ভর সন্ধে। আমি বাস্ থেকে নামামাত্র আমার কাঁধের উপর একখানা হাত পড়লো : মুখ ফিরিয়ে যাঁকে দেখতে পেলাম তিনি ডরথি ব্রেট। আদিতে ছিলেন 'অনারেবল' উপাধি-ধারিণী অভিজাত ইংরেজ মহিলা : ডি. এইচ. লরেন্সের অনুগামিনী হ'য়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবার পর আর ইংলণ্ডে ফিরে যাননি। লরেন্সের প্রথম ভক্তমণ্ডলীর অন্যতম ইনি, তাঁর বিষয়ে প্রথম যুগের একটি পুস্তকের রচয়িত্রী। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আমি নির্ভুলভাবে লরেন্সীয় নায়িকাকে চিনতে পারলাম। দীর্ঘকায়

বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে আঁটো প্যাণ্ট ও কোর্তা, মাথার চুল ধূসর, চোখ তীক্ষ্ণ, মুখের প্রতিটি বার্ধক্যজনিত রেখাতে বুদ্ধি ও উত্তম প্রকাশ পাচ্ছে। করমর্দনের সময় দেখা গেলো যে তাঁর হাতখানা আকারে আমার দ্বিগুণ। 'আমাকে ব্রেট ব'লে ডাকবে, সবাই তা-ই ডাকে আমাকে। পুরুষের মতো পোশাক পরি ব'লে এখানকার কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁয় আমাকে যেতে দেয় না, কিন্তু অন্য আরো ভালো জায়গা আছে—চলো।' এই ব'লে আমাকে তাঁর স্টেশন-ওয়াগনে তুললেন। গাড়ির পিছন দিকে আসন নেই, আছে উঁচু একটা বিছানার মতো ব্যাপার, তাতে বিবিধ কুশানে কম্বলে পরিবৃত হ'য়ে এক বিরাট কুকুর রাজার মতো আসীন। যে-রেস্তোরাঁয় যাওয়া হ'লো সেটা কাঠের বাড়ি, এ-দেশে যাকে লগ্-ক্যাবিন বলে সেই গোছের, মনে হয় যেন হেলাফেলা ক'রে বানানো, কিন্তু বসবাসের অযোগ্য নয়। ইলেকট্রিক আলো জ্বালেনি, টেবিলে-টেবিলে নরম আলো মোমবাতির, আর অগ্নিকুণ্ডে জ্বলন্ত কাঠ লাল আভায় গনগনে। একটুখানি খোলা

উঠোন পেরিয়ে হাত ধোবার ঘরে যেতে হ'লো—ক্ষণিকের জন্য অবাক ক'রে দিলো অন্ধকার, আকাশের তারা, ঘনিষ্ঠ মফস্বলি রাত্রি। আমরা ঢুকতেই চারদিকে রব উঠলো —'হ্যালো, ব্রেট! হ্যালো! কী খবর?' এই ছোটো শহরে এঁকে না চেনে এমন কেউ নেই। আমেরিকার অন্য এক চেহারা দেখা যায় এখানে, সেটা পুরোপুরি নাগরিক বা প্রতীচ্য নয়, ন্যু ইয়র্ক বা শিকাগোর চাইতে এখানকার অনেক বেশি কাছের দেশ মেক্সিকো; যে-স্বল্পসংখ্যক 'ইণ্ডিয়ান' এখনো ম্রিয়মাণভাবে টিকে আছে তারা অনেকেই এখানকার অধিবাসী। লরেন্স যে এই মহাদেশের মধ্যে নিউ মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যকরতাই তার একমাত্র কারণ ব'লে মনে হয় না। ইংলণ্ডে যা নেই, এবং যার অভাবে লরেন্স কষ্ট পেতেন, সেই প্রসার এখানে অপর্যাপ্ত, ভৌগোলিক ও চারিত্রিক দুই অর্থেই। আহারের পরে ব্রেট আমাকে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে কিছুটা বাঙালি ধরনে খোলামেলা আড্ডা হ'লো। যে-হোটেলে

রাত কাটালুম সেখানেও হোটেলিয়ানা খুব কম; ভিড় নেই, অতএব ব্যস্ততাও নেই, চালচলন ঢিলেঢোলা গোছের; দিন-রাত্রির যে-কোনো সময়ে বিনামূল্যে ধোঁয়া-ওঠা কফি বা চা পাওয়া যায়; সকলেরই সকলের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে এবং সময় আছে; যাঁরা কুড়েমি করার শক্তি ধারণ করেন তাঁদের পক্ষে আদর্শ জায়গা।

পরের দিন সকালে ব্রেট আমাকে নিয়ে গেলেন একটি 'ইণ্ডিয়ান' 'পোয়েবলো' বা গ্রাম দেখতে। সেখানেও অনেকে তাঁর পরিচিত; যারা ইংরিজি জানে (সকলে জানে না) তারা কেউ-বা এগিয়ে এসে আলাপ করলে। বাড়িগুলো মাটির, একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত তাদের উচ্চতা; লোকগুলোর হাব-ভাব গম্ভীর, মুখে হাসি নেই, কথাও কম; আমাদের সাঁওতালদের মধ্যে যেমন একটি প্রফুল্ল সরব কর্মিষ্ঠতা দেখা যায়, এখানে তার বদলে যেন একটা নির্বেদের ভাব ছড়িয়ে আছে; এদের অনিবার্য অবলুপ্তির অচেতন জ্ঞান তার কারণ হ'তে পারে। আমরা একটা পুকুরের দিকে

যাচ্ছিলুম ; একটি ছোটো মেয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে তার ভাষায় এবং হাত-মুখ নেড়ে, আমাদের নিষেধ করলে ; বোঝা গেলো, ঐ পুকুরটা ট্যাবু, কোনো বিজাতীয় লোক তার ধারে গেলে অপদেবতার দৃষ্টি পড়বে। ও-রকম পবিত্রতা অবশ্য বাড়িগুলোর নেই ; এক গৃহস্থের ঘরের মধ্যে, ব্রেট যেহেতু পরিচিত, ঢুকে পড়া গেলো। দেখলাম, অতীতে ও বর্তমানে মিলে এক জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে: মোষের শিং, মাদুলি, পাখির পালকের সাজ, অব্যবহৃত তীর-ধনুক—এ-সবের সঙ্গে সাজানো আছে ইলেকট্রিক টর্চ, চামড়ার বেল্ট, এলুমিনিয়মের বাসন, আর আরো অনেক কলে তৈরি কম দামের জিনিশ। করুণ লাগলো দৃশ্যটা ; আমার মনে পড়লো এক লাল সর্দার, এদেরই পূর্বপুরুষ, সদ্য-আসা শ্বেতাঙ্গদের কাছে কয়েক পয়সায় বেচে দিয়েছিলেন—মান্নাহাট্টা দ্বীপ—যেখানে আজ আকাশ-আঁচড়ানো ন্যু ইয়র্ক দাঁড়িয়ে। সে-দৃশ্য আজ ম্যুজিয়মে দেখানো হয় ; এই 'পোয়েবলো', আর স্বল্পভাষী বিমর্ষ মানুষেরা—ম্যুজিয়মের পুত্তলিগুলি সপ্রাণ হ'লে

যা হ'তো, এরাও যেন তা-ই; যেন ম'রে গেছে, কিন্তু এখনো সৎকার করা হয়নি; গোধূলির ছায়ায় অর্ধলীন হ'য়ে অস্পষ্টভাবে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

এর পরে ব্রেটের বাড়িতে আধ ঘন্টা কাটলো। ছাত্র বয়সে যখন ঢাকায় ছিলুম, রমনার নীলখেতের একটি বাড়িকে আমি মনে-মনে নাম দিয়েছিলুম 'পৃথিবীর সীমা'। তারপরে আর বাড়ি ছিলো না, শহর ছিলো না, শুধু দিগন্তকে বিদীর্ণ ক'রে একটি রেল-লাইন চ'লে গেছে। ব্রেটের বাড়ি দেখে সেই স্মৃতি আমার মনে জাগলো—কিন্তু এর নিঃসঙ্গতা ঢের বেশি তীব্র। প্রতিবেশী বাড়ি একটিও নেই, চারদিকে শুধু ঢেউ-খেলানো বৃক্ষবিরল মাটির বিস্তার, রোদ্দুরে তাদের ধূসর-ব্রাউন রংটিকে বেশ কড়া লাগছে। চারদিক এমন শব্দহীন, গতিহীন ও আকাশের দ্বারা আপ্লুত যে মনে হয় সত্যি বুঝি পৃথিবী এখানে শেষ হ'য়ে গেলো। একা, শুধু একটি কুকুরকে সঙ্গী ক'রে, এই নির্জনে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন প্রৌঢ়া চিরকুমারী। লম্বা ছাঁদের একতলা কাঠের

বাড়ি, মার্কিনীরা যাকে 'লিভিংরুম' বলে সেটি বেশ বড়ো, আর সেখানে যেমন-তেমন ছড়িয়ে আছে শেষ-করা, আরম্ভ-করা, অর্ধসমাপ্ত ছবি, আর রং তুলি ইজেল ইত্যাদি সরঞ্জাম। ছবি আঁকেন ব্রেট, তাঁর রচিত কয়েকটি ক্যানভাসের সোনালি-নীল পটভূমি থেকে লরেন্সের তীক্ষ্ণ চোখ আমাকে বিদ্ধ করলে। জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে এক পাহাড়, মাথায় তার টুপির মতো স্তম্ভ; লরেন্সের স্মৃতিসৌধ সেটি, তাঁর পত্নী ফ্রীডার নিবেদন। 'ওখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু এখনো পুরোপুরি বরফ গলেনি, পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা যাবে না।···আমি লরেন্সকে অনেক বলেছিলুম য়োরোপে ফিরে না-যেতে, এখানে এসে তাঁর শরীর অনেক সেরেছিলো, থেকে গেলে অমন অকালে মৃত্যু হ'তো না।···তোমার সঙ্গে লরেন্সের দেখা হওয়া উচিত ছিলো; তোমার ভালো লাগতো তাঁকে, ভালো লাগতো।' যে-অল্প কয়েকটা বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার তিলতম সন্দেহ নেই এটা তারই একটা, তাই আমি এ-কথার কোনো জবাব দিলুম না।···'আমার একটা ছবি

উপহার দিই তোমাকে, দেশে নিয়ে যেয়ো। এইটে—?'

ব্রেটকে নিয়ে শহরে ফিরে এলুম লাঞ্চ খেতে। যেখানে-সেখানে ছবির মেলা, রেস্তোরাঁর মালিকও কিছু আর্টের চর্চা করেন; এর মধ্যে যে সবটাই খাঁটি তা বিশ্বাস করতে হ'লে অত্যন্ত বেশি আশাবাদী হ'তে হয়। তবে যাকে বলে একটা আবহাওয়া আছে। রাস্তায় মাঝে-মাঝে ভিখিরি, রঙিন ঘাঘরা আর কম্বল জড়ানো অলস 'ইণ্ডিয়ান', খুব একটা কেজো অথবা পোশাকি ভাব কোনোখানেই নেই। এই বিমিশ্র ও চিত্রল আমেরিকার মধ্যে ডরথি ব্রেট—পুরোনো পৃথিবী থেকে ছিটকে-পড়া; লরেন্সের প্রতিভার প্রভাবে যে-সব মেয়েদের জীবন ব্যর্থ অথবা সার্থক হয়েছিলো তাঁদেরই একজন—তাঁর উচ্চ-বর্ণশোভন ইংরেজ উচ্চারণ,* কাটাছাঁটা ইংরেজ হিউমার, তাঁর বিদ্রোহী পোশাক, ব্যবহারে

---

* 'Trout' শব্দের তিনি উচ্চারণ করলেন 'ট্রাট'। এটা আমি আর কারো মুখে শুনিনি, অক্সফোর্ড অভিধানেও বলে না।

মার্কিনী স্বাচ্ছন্দ্য, আর সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সহজ আত্মপ্রত্যয়—আমি ব'সে-ব'সে এই সব উপভোগ করলুম আরো ঘণ্টাখানেক, আমার স্মৃতিতে টাঅসের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে গেলেন।

তেমনি, আমার পক্ষে, বিগ সূর-এ হেনরি মিলার। আশ্চর্য মানুষ, জায়গাটিও আশ্চর্য। টাঅসের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতিতে মিল থাকলেও, বাইরের দৃশ্য একেবারে আলাদা। মিলারের এক বন্ধুর সঙ্গে এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে আসতে-আসতে দেখি, রাস্তার একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, আর-একদিকে সারি-সারি পাহাড় উঠে গেছে। ছোটো পাহাড়, আমাদের হিশেবে টিলাও বলা যায়, কিন্তু গায়ে-গায়ে অরণ্য এত ঘন যে দেখতে গম্ভীর। ধাপে-ধাপে নয়, এক-একটি পাহাড়ের মাথার উপর এক-একটি বাড়ি, নিচে থেকে সবটা তার চোখে পড়ে না। মালিকেরা রাস্তার উপরে স্বনামাঙ্কিত মস্ত লোহার চিঠির বাক্স বসিয়েছেন, ডাকপিওন সেখানেই চিঠিপত্র রেখে চ'লে যায়, আর তাতেই বোঝা যায় কোন বাড়ির বাসিন্দা কে। নেই রাস্তার নাম

অথবা বাড়ির নম্বর ; এমনি কয়েকখানা বাড়ি—
বনানীর মধ্যে, পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের
মুখোমুখি : তা-ই নিয়ে বিগ শূর। এমন এক
পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছি, যার আদিম
রূপ এখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি ; ইংরেজিতে যাকে
বলে 'ঈশ্বরের প্রাচুর্য', এ যেন তা-ই ; মনে হয়
এখানে একটি আস্ত পাহাড়ের উপরে বাড়ি
তুলে বসবাস করতে লেগে গেলেই হ'লো,
কাঠখড় হাতের কাছেই ছড়িয়ে আছে ; কেউ
কিছু বলবার নেই। এখানে যেন এখনো
বিশ্বাস করা সম্ভব যে প্রকৃতি স্নেহময়ী।

ছোটো-বড়ো গাছ, ঝরা পাতা, লম্বা ঘাস ;
—মধ্যখানে আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি পাহাড়ে
উঠলো, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পৌঁছলাম।
কাঠের বাড়ি—এখানেও সেটাই রেওয়াজ,
বাঁধানো উঠোনে আমার নিমন্ত্রণকর্তা দাঁড়িয়ে।
তিনি এগিয়ে এসে যে-ভাবে আমার করমর্দন
করলেন, তা আমি এখনো ভুলিনি। অনেকে—
আর তাঁদের মধ্যে মহিলা বেশি—এই প্রথাটিকে
শিষ্টাচারের কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত করেন,
এমনভাবে দুটি নিষ্প্রাণ আঙুলের ডগা বাড়িয়ে

দেন যেন কোনো অবাঞ্ছিত স্পর্শের সংকোচ কাটাতে পারছেন না। এটা সাধারণত ঘটে বড়ো পার্টিতে স্বল্পপরিচিত মহলে, কোনো মানবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনার বাইরে; সেখানে হয়তো নিতান্ত নিয়মরক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু 'যাকে আমরা হৃদয় দিতে পারি না তাকেও আমাদের কিছু দেবার আছে,' এ-কথাটার প্রমাণ ওতে পাওয়া যায় না। আবার অনেক মার্কিনী পুরুষ, করতল সুদ্ধু পাঁচটি আঙুল টান ক'রে দিয়ে, সমস্ত বাহুটিকে সোজা তলোয়ারের মতো বাড়িয়ে দেন; এটাকেও কেমন সামরিক ভঙ্গি ব'লে মনে হয়, বা অস্তিত্বহীন হৃদ্যতার দেখানো-পনা। কিন্তু মিলারের হাতের চাপ একেবারে পূর্ণ, সপ্রাণ ও সবল, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা 'হাতে রাখা' নেই, আছে উষ্ণ ও অব্যবহিত হৃদয়ের সম্ভাষণ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁর পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হলাম।

যদি না বার্ধক্যে আমার স্মৃতিলোপ ঘটে তাহ'লে, যতদিন বেঁচে আছি, বিগ সূর-এ হেনরি মিলারের গৃহস্থালির কথা ভাবতে আমার ভালো লাগবে। কৃশ, ঋজু, দীর্ঘাকার

হেনরি, বাটের কাছাকাছি বয়স; স্ত্রী, ঈভ, সুন্দরী ও প্রৌঢ়যৌবনা; দুটি চার ও পাঁচ বছরের সন্তান, ডান ও টোনি, নীল চোখ ও পট্টবর্ণ চুলে নয়নহরণ। ঈভ আগে ছিলেন অভিনেত্রী; এটি তাঁর তৃতীয় ও হেনরির দ্বিতীয় বিবাহ। ছেলেমেয়ে দুটি হেনরির পূর্ব-পক্ষের, তারা পালা ক'রে বছরে ছ-মাস বাপের ও ছ-মাস মায়ের কাছে থাকে। হেনরির মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা; কথা বলেন ধীরে ও ঈষৎ শ্লথভাবে; ঘাড় হেলিয়ে মনোযোগপূর্বক অন্যের কথা শোনেন। ইনি খাশ আমেরিকান, এঁর জীবনেও মার্কিন-দেশের চরিত্র প্রতিফলিত। জন্ম গরিবের ঘরে, কলেজে পড়াশুনোর সুযোগ পাননি, যৌবনে টেলিগ্রাফের কেরানিগিরি ক'রে জীবিকা চালাতেন। এমন দিন গেছে যখন ন্যু ইয়র্কে শীতের শেষে নগণ্য দামে গা-ছাড়া করেছেন ওভারকোট। সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ ক'রে প্যারিস; সমবয়সী অন্য অনেক মার্কিনী লেখকের মতো, উদ্বেল ও বিপদসংকুল বোহেমিয়ায় নিমজ্জন। ফিরে এলেন যৌবনের

শেষে কুখ্যাত ও বিখ্যাত হ'য়ে; তাঁর প্যারিসে ছাপা কয়েকটি উপন্যাস এখনো অ্যাংলো-স্যাক্সন জগতে নিষিদ্ধ।* লেখা, ছবি আঁকা, বিগ সূর-এর নিসর্গ ও সংসর্গ—এই দিয়ে আপাতত রচিত তাঁর জীবন। কদাচ পূর্বতটে যান, বিশ্ববিদ্যালয় বা ফাউণ্ডেশনগুলির সঙ্গে সংস্রব নেই; তাঁর অবস্থা কোনো-কোনো মধ্যবয়সী বাঙালি লেখকের মতো—কিছুটা খ্যাতি হ'য়ে থাকলেও অর্থ আসেনি, 'এক-একদিন এমনও হয় যে বিদেশে একটা চিঠি লেখার জন্য দশ সেণ্ট জোটে না।' হয়তো য়োরোপে দীর্ঘ প্রবসনের জন্য, বা স্বভাবেরই প্রভাবে, তাঁর কয়েকটা অভ্যেস লক্ষণীয়ভাবে অমার্কিনী; ইনি চিঠি লেখেন সর্বদা 'লম্বা হাতে', তাও অনাধুনিক ফাউণ্টেন-পেনে: জেট প্লেন ও কাফেটেরিয়ার জগৎকে অন্য যে-সুবিধাজনক ও নিশ্চরিত্র লেখন-যন্ত্র জয় ক'রে

---

* ১৯৬১-তে, প্রথম প্রকাশের সাতাশ বছর পর, তাঁর একখানা এ-যাবৎ নিষিদ্ধ উপন্যাসের মার্কিনী প্রচার সম্ভব হ'লো। ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতি ও বিত্ত দু-ই বর্ধিত হয়েছে।

নিয়েছে, সেই তথাকথিত ডট-পেন ব্যবহার করেন না এমন আমেরিকান আমি এঁকেই শুধু দেখেছি। এবং বন্ধুতার স্থাপনে ও লালনে ইনি যদিও প্রতিভাবান, তবু এঁর ব্যক্তিত্বটি সংবৃত ; আমাকে ভালোবেসেও 'মিস্টার বোস' ভিন্ন আর-কোনো সম্বোধন করলেন না ; সেটা আমার পক্ষে বেশ মনোমতো হ'লো।

পক্ষান্তরে, ঈভ দু-লাইন চিঠি লিখতে হ'লেও টাইপরাইটার খুলে বসেন, তাঁর কথা উচ্ছল, চলাফেরা দ্রুত, সরলতায় ও কৌতূহলে ভরা চোখ, নিজেকে এমন সহজভাবে প্রকাশ করেন যা শুধু মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব। আমি যেন তাঁকে 'ঈভ' ব'লে ডাকি, এই ইচ্ছাটি তিনি অনেকবার ব্যক্ত করলেন, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে আমার সঙ্গে বরং হেনরির মিল অনেক বেশি। কিন্তু এই দুই ভিন্ন চরিত্রের মানুষের যুগপৎ সঙ্গ আমার পক্ষে খুব আনন্দের হ'লো। যাতে রান্নার সময়ে স্ত্রীকে নির্বাসিত হ'তে না হয়, সেইজন্য লিভিং রুমেরই এক অংশে রান্না-ঘর পেতে নেয়া হয়েছে ; কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কথা চলে, কিছু-একটা চাপিয়ে ঈভ এসে

বসেন আমাদের সঙ্গে। হয়তো ঈভ কথা বলেন, হেনরি এলিয়ে ব'সে সিগারেট খান, টোনি, ভাল ও আমাকে নিয়ে হেনরি বেরোন বেড়াতে, আর ঈভ বাড়িতে থাকেন স্বামীর মনোমতো ক'রে মুর্গি রাঁধার জন্য ; আবার কখনো ঈভ গাড়ি চালান, হেনরি একটু [illegible]য়ে নেন সেই ফাঁকে। গাড়ি না-থাক[illegible]লিফর্নিয়ায় বাস করা দুঃসাধ্য, বিগ সূর-এ অসম্ভব। এখান থেকে নিকটতম বাজার সেই কার্মেল শহরে, নিকটতম ড্রাগ-স্টোর কোন না পাঁচ-সাত মাইল দূর হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হ'য়েও বিগ সূর-এ টেলিফোন নেই,* যে-কোনো ছোটো কাজেও নিজে না-বেরোলে চলে না। তাই গাড়ি চাই, আর এখানে গাড়ি মানেই স্টেশন-ওয়াগন। হেনরিরও আছে একটি ; সেই যানে, রাত দশটার পরে, তিনি আমাকে আমার শয়নাগারে পৌঁছিয়ে দিলেন।

হাকোনের মতো, বিগ সূরও স্বাস্থ্যকর স্নানের জন্য নামজাদা। একটা জায়গায় প্যাসি-

---

* আমি ১৯৫৪-এর কথা বলছি ; এখনকার অবস্থা জানি না।

ফিক একটু দ্রুত রেখায় বেঁকে গেছে, তার কাছে এলে তীব্র একটা গন্ধ পাওয়া যায়। প্রকৃতি এই জলের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে গন্ধক ; জল তাই তপ্ত, ফেনিল ও সধূম ; তট ঘেঁষে, শিলা-খণ্ডগুলিকে ঝাপসা ক'রে দিয়ে, এক বুদ্বুদময় আলোড়ন চলছে সব সময়। কাছেই আছে স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভাড়া নেবার জন্য কয়েকটি কাঠের কুঠুরি ; তার একটি, হেনরি মিলারের গরজে, আমার জন্য ঠিক করা ছিলো। উদ্ভিদের সবুজে ও ঘনতায় বেষ্টিত পাহাড়, তার তলায়—বড়ো হোটেল বা বিলাসী বাংলো নয়, সরল কুঠুরিতে বহুদিন পর রাত্রিকে খুব গভীরভাবে অনুভব করলাম। বাঁকা চাঁদ, কুয়াশায় চ্যাপ্টা, সমুদ্রের উপর ঝুলে আছে ; তাকে দলিত ক'রে অন্ধকারের তোরণ উঠেছে আকাশ পর্যন্ত ; শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে, ঘুমন্ত লোকের পাশ ফেরার মতো, বোবা গাছগুলোর অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়। ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়ামাত্র কালো রাত্রির প্লাবন নামলো আমার উপর। আমার পিছনে অরণ্য আর সামনে মহাসাগর, আমার চেতনার মধ্যে পশ্চিমতম

আমেরিকা, মধুর বন্ধুতা, অন্ত কত বন্ধুতার স্মৃতি, কত হারিয়ে-যাওয়া, ফিরে-পাওয়া এবং আবার যাকে হারাতে হবে এমনি সব স্বপ্ন : মনে হ'লো এই রাত্রিটি ঘুমের জন্ত তৈরি হয়নি। এই কথাটাকেই বলার জন্ত কবিতার লাইন ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে সমুদ্রের সঙ্গে ভালো ক'রে দেখা হ'লো। এখানে আধো-চাঁদের আকার নিয়েছে প্যাসিফিক, যেন ছুই হাত বাড়িয়ে মাটিকে আঁকড়ে আছে ; আর তট যেখানে ঢালু হ'য়ে-হ'য়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে ঠিক সেখানেই কুঠুরির মালিক রেস্তোরাঁ বসিয়েছেন। আমার প্রাতরাশ শেষ হ'তে-হ'তেই হেনরি মিলার আমাকে নিতে এলেন।

কাঠের কুঠুরিতে ছুই নিস্তব্ধ রাত্রি আর মিলার-দম্পতির সঙ্গপূর্ণ ছুই আনন্দিত দিন দ্রুত কেটে গেলো। দেখলাম রেড-উড বৃক্ষের অরণ্য, সবুজ অন্ধকারে ভরা আরণ্যক ছুপুর, ড্রাগ-স্টোরের জানলা দিয়ে শ্লথস্রোত সবুজ বিগ সুর নদী—অনেকটা আমাদের পূর্ববঙ্গের খালের মতো, কিন্তু ছুই দিকের তরুপল্লব অনেক বেশি নিবিড়—মিলারের উঠোন থেকে আবছা লাল

সূর্যকে নেমে যেতে দেখলাম সমুদ্রের মধ্যে। গন্ধকজলে স্নানও করা হ'লো*। কিন্তু সবচেয়ে আমার যা বেশি মনে পড়ে তা গৃহস্বামী ও স্বামিনীর আতিথ্য, তাঁদের আলাপ, আগ্রহ,

---

* এই স্নানের একটা বর্ণনা সংক্ষেপে দেয়া যেতে পারে। সমুদ্রে যেখানে গরম ধোঁয়া উঠছে, তার ধার ঘেঁষে স্নানের ব্যবস্থা—মেয়ে ও পুরুষের জন্য আলাদা। একটা টবে গরম গন্ধকজল, পাশে আর-একটাতে সাধারণ জল রাখা আছে—পরে পরিষ্কৃত হবার জন্য। হেনরি আমাকে নিয়ে এসে বললেন, 'নেমে পড়ো।' কোনোরকম আব্রু নেই, সারি-সারি টব সাজানো আছে; হেনরি আধ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবৃত হ'য়ে গন্ধক-জলে দেহ ডুবিয়ে শুয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, ভারতীয় অভ্যাসবশত তাঁর অনুকরণ করা আমার পক্ষে সহজ হ'লো না; আমি কোনোরকমে একটুখানি গা ভিজিয়ে পুনশ্চ দ্রুত সবস্ত্র হ'য়ে নিশ্বাস ফেললুম। দেখলুম, এক পিতা এলেন শিশুপুত্রকে নিয়ে; দু-জনেই আদমের বেশে অনায়াসে স্নানে নামলেন। আমার অবশ্য অজানা ছিলো না যে পাশ্চাত্ত্য সমাজে অনাবরণ নিষিদ্ধ হয় শুধু মেয়ে-পুরুষ একত্র থাকলে, কিন্তু অন্য দু-একটি সংস্কারের মতো, আমাদের শারীরিক লজ্জা এখনো দুরপনেয়।

হেনরির স্বতঃস্ফূর্ত, মনোযোগী ও উচ্ছ্বাসহীন বন্ধুতা। আমাকে একটি তাম্রমুদ্রাও তিনি খরচ করতে দিলেন না; কুঠুরির ভাড়া, এমনকি প্রাতরাশের দাম—আমার ব্যাকুল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সবই তিনি মিটিয়ে দিলেন; এর প্রেরণা, আমি জানি, নেহাৎ সৌজন্যবোধ [illegible] হৃদয়ের পরামর্শ। নিশ্চয়ই তাঁর হাতে তখন অনেক কাজ ছিলো, কিন্তু এই দু-দিনের সবটুকু সময় তিনি আমার জন্য ক্ষয় করলেন—একবারে প্লেনে তুলে দেয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গদানে বিরাম ছিলো না। অথচ তিনি আমাকে জানেন শুধু চিঠিপত্র এবং ক্ষণিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে; আমার ভাষা তাঁর অজানা; আমার রচনা, চেষ্টা, সংকল্প —সবই তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে; যাকে অর্থহীন বিনয় না-ক'রে আমি বলবো আমার আসল অংশ, তা তাঁর পক্ষে প্রদোষান্ধকারে আবৃত। কিন্তু তাঁর কিছু লেখা আমি পড়েছি, তাঁর পটভূমি ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, বিনা আলাপেও তাঁকে ধারণা ক'রে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব। এ-দিক থেকে আমাদের সম্বন্ধে সাম্য নেই,

তাঁর দিকে পাল্লা অনেক ভারি। ভারি এই অর্থে যে আমাকে এমন সহজে ও সম্পূর্ণ-ভাবে তিনি গ্রহণ করলেন, যেন, আমার কোনো লেখা না-প'ড়েও, আমার অন্তর তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেন তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে কাছে ব'সে, কথা শুনে যেটুকু পাওয়া যায়, তা পেরিয়েও আমার কিছু মূল্য আছে। আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে, অন্যদের কাছেও এই রকম বন্ধুতা আমি মাঝে-মাঝে পেয়েছি, এখন জাপানে এসেও তা ভাগ্যে জুটে গেলো। আমার ব্যর্থ জীবনের এই একটি অমল উপার্জন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি।

১৯ জানুয়ারি

প্রাতরাশ শেষ; আমাদের যাবার সময় হ'লো। দু-চারটে ছড়ানো জিনিশ গুছিয়ে

নিয়ে নিচে নামলুম। আমাদের অপেক্ষায় সামনের দরজার কাছে সিঁড়ির উপর ওবারা ব'সে আছেন—সকালবেলা তাঁকে ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কাপড়ের চটি ছেড়ে গত সন্ধ্যার পরিত্যক্ত জুতো প'রে নিলুম আমরা; সরাইখানার মালিক ও দাসী তেমনি আনত হ'য়ে অভিবাদন করলে। ওবারা এলেন আমাদের সঙ্গে গাড়ির দরজা পর্যন্ত; এই সদাশয়, সদানন্দ, বৎসল মানুষটির কাছে অবশেষে বিদায় নিতে হ'লো। গাড়ির ব্যবস্থা তিনিই করেছেন, যাতে টৌকিওতে ফেরার আগে হাকোনের ন্যাশনাল পার্ক আমরা দেখতে পাই। এই ভ্রমণ ও রাত্রিযাপনের সমস্ত ব্যয়ও তিনি বহন করলেন।

এঁকে-বেঁকে অত্বরবেগে গাড়ি চলেছে; আমাদের চোখ চারদিকে চপল। ডাইনে ও বাঁয়ে, সামনে ও পিছনে—সবই দ্রষ্টব্য, সবই সুন্দর। পাহাড় ও হ্রদ, স্রোতস্বিনী ও বনভূমি, যেন অন্তহীন। যেখানে স্বচ্ছ নীল আশি হ্রদের মুকুরে শুভ্র ফুজিয়ামা নিজেকে অবলোকন করছে

ঠিক সেখানে, তুষারচূড়ার মুখোমুখি, একটি চিত্তহারী হোটেল। পথে-পথে প্রস্রবণ, কোথাও পাহাড়ের গা ফেটে উত্তাপের ধোঁয়া উঠছে, কোথাও হ্রদের মধ্যে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য স্টীম-লঞ্চ অপেক্ষমাণ; আর কোথাও বা সেডার পাইন মেপলের রহস্য দুই দিকে ছায়া ক'রে আছে। মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে উপত্যকায় বসতি, দূরে কোনো মঠ বা সরাই-খানার সিন্দূরবর্ণ ঢালু ছাদ, কখনো বা গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। বাঁকা পথ, বাঁকা জল, জলের উপর বাঁকা পুল, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে হালকা-রেখা আকাশ: নটীর মতো শিল্পিত এক প্রকৃতি। হিমালয়ের মতো ভীষণ বা আল্পসের মতো উত্তুঙ্গ নয় দৃশ্য; বিগ স্যুর-এর মতো বন্যতাও নেই;—সাজানো, গুছোনো, পরিপাটি ও ত্রুটিহীনরূপে রমণীয়।*

---

* পরে, ডেনমার্কে ও বাভারিয়ায় গিয়ে, হাকোনের কথা আমার মনে পড়েছে।

এই সপ্তাহে টোকিওতে কোনো নো নাটক দেখানো হচ্ছে না; ওটা-দম্পতিকে নিয়ে একটা কাবুকি দেখতে এসেছি। উৎসাহ আমারই, কেননা আগে একবার ন্যু ইয়র্কে কাবুকি নামাঙ্কিত নৃত্যাভিনয় উপভোগ করেছিলাম।—কিন্তু সেটা যে খাঁটি জিনিশ ছিলো না, আর তার মিশোলের অংশে যে প্রতীচীর অবদান ছিলো অনেকখানি, তা বুঝতে, টোকিওর থিয়েটারে পরদা ওঠার পর কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগলো।

আমাদের হোটেলের প্রায় পাশের বাড়ি এই থিয়েটার, এখানে কাবুকি ভিন্ন আর-কিছু অভিনীত হয় না, এবং শীত ঋতুতে প্রত্যহ

অনুষ্ঠান থাকে। এ থেকেই বোঝা যাবে কাবুকি কতদূর জনপ্রিয়। নো যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত, কাবুকি তেমনি লৌকিক ধারার আশ্রয়স্থল। এতে মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পুরুষরা—বালক নয়, বয়স্ক পুরুষ ; নাটকে থাকে হাস্য, শোক, ত্রাস প্রভৃতি নানা রসের আবেদন, সংগীতের অংশ প্রচুর, এবং সাধারণত সমাপ্তি হয় সুখের। অনেকটা আমাদের যাত্রার মতো ব্যাপার—যদিও রঙ্গ-মঞ্চের গঠন পুরোপুরি প্রতীচ্য ; এতেও আছে এমন গায়কবৃন্দ যারা নাটকের কুশীলব নয়, শুধু গানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। ন্যু ইয়র্কের কাবুকিতে এই গায়কবৃন্দ ছিলো না, মেয়েদের ভূমিকায় ছিলেন নটীরা, কাহিনী ছিলো ব্যালে-র মতো সরল, আর নাচের কোনো-কোনো ভঙ্গির মধ্যেও ধ্রুপদী ব্যালের আমেজ ছিলো। সেই স্মৃতি নিয়ে এখানে এসে প্রতিহত হলাম।

বেশ বড়ো প্রেক্ষাগৃহ, একটি আসনও তার খালি নেই। নাটকের প্রধান নায়িকা প্রথম থেকেই উপস্থিত। এই ভূমিকায় যিনি নেমেছেন

তিনি বর্তমানে জাপানের সবচেয়ে বিখ্যাত 'নারী-অভিনেতা'। তাঁর কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি অবিকল মেয়েলি, তাঁর কাঁধ চওড়া, কটি ক্ষীণ নয়, কিন্তু নায়িকাটিও প্রৌঢ়া ব'লে তা মানিয়ে গেছে। তাঁর অভিনয়, ও নাটকের অগ্রগতি, প্রভৃত আনন্দ দিচ্ছে সকলকে, শুধু আমরা দুই অদীক্ষিত বাঙালি কাষ্ঠপুত্তলির মতো ব'সে আছি। নাটকের কাহিনীটি যেমন দীর্ঘ তেমনি জটিল, আর তার মধ্যে অর্থগৌরবও বেশি কিছু নেই—অন্তত ইংরেজি চুম্বক প'ড়ে তা-ই মনে হচ্ছে আমাদের; জাপানকে এত ভালোবেসেও এই অভিনয়ের আমরা রসগ্রহণ করতে পারছি না; বর্বর ঘুমের আক্রমণে আমি তো থেকে-থেকেই বিহ্বল হ'য়ে পড়ছি: প্র. ব. আমাকে পীড়ন ক'রে জাগিয়ে দিচ্ছিলেন ব'লে কিছুটা তবু দেখতে পেয়েছিলাম। খুব লজ্জা পেলাম ওটা-দম্পতির কাছে, আপ্রাণ সচেষ্ট হলাম মনঃসংযোগে; কিন্তু দুটো অঙ্ক ধ'রে কসরৎ করার পর হার মানতে হ'লো, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় রইলো না। হোটেলে ফিরে জাপানি বন্ধুদের নিয়ে যখন

আহারে বসলাম, ততক্ষণে আমার নিদ্রালুতা অবশ্য সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

যা অসংখ্য জাপানির পক্ষে উপভোগ্য, আমরা কেন তা থেকে কিছুই নিতে পারলুম না? ভাষা জানি না ব'লে? কিন্তু জর্মান ভাষাও আমি জানি না, তবু হ্বাগনার-এর অপেরাতে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরতে হয়নি। আসল কথা, হ্বাগনার-এর জগৎ আমার পরিচিত, তাঁর পাত্র-পাত্রীর জীবনী আমার অজানা নেই, আর য়োরোপীয় গান, তাতে আমার রক্তের টান না-থাকলেও আমার পক্ষে তা একেবারে অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই কাবুকির অভিনয় যে-সব প্রচলের উপর নির্ভর করছে সেগুলি—শুধু জ্ঞানের নয়, আমার ধারণার পর্যন্ত বাইরে। সেই পটভূমির অভাবে, তার ভঙ্গি বা ভাব বা সংগীত আমার মনে লেশমাত্র সাড়া জাগাতে পারলে না। জাপানি ভাষায় অজ্ঞ হ'লেও ক্ষতি ছিলো না, যদি এর অভিনয়ের ভাষা আমি জানতুম। সেই গভীরতর সাংকেতিক ভাষা জানা নেই ব'লে, একবার এর্নাকুলমে গিয়ে, আমি কথাকলি নৃত্যের সামনে নিস্তাপ ও

অসহায়ভাবে ব'সে ছিলুম। শুধু 'প্রেমে'র অভাবেই 'গানভঙ্গ' হয় না, তার জন্য অশিক্ষাও দায়ী। 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে'—এটা নিশ্চয়ই পরম গুণগ্রহণের শর্ত, কিন্তু চরম শিক্ষা না-থাকলে এই অবস্থাটি অসম্ভব।

২২ জানুয়ারি

জাপানে আমার শেষ কর্তব্য—রেডিওতে বক্তৃতা — গতকাল সম্পন্ন করেছি। যাবার আগে আজকের দিনটা ছুটির। মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ ছিলো এক বাঙালি রাজপুরুষের বাড়িতে; সেখানে মুগের ডাল ও আলুকপির ডালনায় প্র. ব. চমৎকৃত, আর সর্ষে দিয়ে রাঁধা মাছের ঝোলে, আমি। সন্ধেবেলা ওটা-দম্পতি এলেন;

রাত্রে, হোটেলের দরজায়, আমাদের এখানকার নিত্যসঙ্গী সাবুরো ওটার কাছে বিদায় নিতে হ'লো। এ-যাত্রায় তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

কেন এমন হয় যে বিদেশীমাত্রেই জাপানে এসে দেশটার প্রায় প্রেমে প'ড়ে যান? অন্যান্য দেশ নিয়ে মতভেদ ঘটে, শোনা যায় নানা জনের মুখে নানা দিক থেকে প্রশংসা বা তার উল্টোটি, আর নিভাঁজ প্রশংসা, বিলেত-পাগলা দিশি ছোকরাদের মুখে ইংলণ্ড বিষয়ে ছাড়া, প্রায় কারো মুখেই শোনা যায় না। কিন্তু জগৎ যেন জাপান বিষয়ে একমত; হোক য়োরোপীয়, ভারতীয় বা মার্কিনী, সকলের পক্ষেই জাপানের মোহ দুর্বার। সকলেই, জাপান বিষয়ে কিছু বলতে গেলে, স্বতই একই ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করেন; আমার এই লেখাটাতেও ছড়িয়ে আছে 'মনোরম', 'রমণীয়', 'সুচারু', প্রভৃতি শব্দপর্যায়, যার মর্মাংশ হ'লো—মনোমুগ্ধকর। এবং মনোমুগ্ধকর বলতে ঠিক যা বোঝায়, উদারতম ও গভীরতম অর্থে জাপান হ'লো তা-ই; তার মানুষ, তার নিসর্গ, তার আচার-ব্যবহার—বাইরে থেকে হঠাৎ এসে

যা-কিছু চোখে পড়ে, কোনোটাই এই বর্ণনার বহির্ভূত নয়। আছে এমন দেশ যার দৃশ্য ভীষণের মিশ্রণে আরো বেশি সুন্দর, যার সভ্যতা আরো পুরোনো বা সমৃদ্ধ, কিংবা যার উন্নতির স্তর আরো বেশি উঁচু ;—কিন্তু আর-কোনো দেশ নেই, যাকে চোখে দেখা মানেই ভালোবাসা—আর তা কোনো স্মৃতি বা অনুষঙ্গের প্রভাবে নয়, তার নিজেরই জন্য।

নিশ্চয়ই এর একটা কারণ জাপানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব বিপুল; অধিবাসীরা মঙ্গোলীয়, তাদের চোখ মুখ ভাষা রীতিনীতি সবই আমাদের পক্ষে অচেনা ; এবং এই দেশ, যা এই শতকের প্রারম্ভ থেকেই আধুনিক বিদ্যায় য়োরোপের সমকক্ষ, তা জগৎ-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলো মাত্রই সেদিন। এই রকম চমকপ্রদ সমন্বয় অন্য কোনো দেশে ঘটেনি। যা নিতান্ত বৈদেশিক ব'লেই নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী—যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে 'exotic'—প্রতীচ্যদের, এবং আমাদের পক্ষেও, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ

জাপান। আর সেই সঙ্গে মিলিত হয়েছে এর আশ্চর্য সাংসারিক উত্তম ও কর্মিষ্ঠতা, যা দেশটাকে রাতারাতি বদলি ক'রে দিয়েছে মধ্য-যুগ থেকে বিশ শতকে। যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, তারিফ না-ক'রে উপায় নেই। বিশেষত আমরা যারা এমন এক দেশ থেকে আসছি যেখানে 'প্রাচী' নামক এক অবাস্তব বা সুদূরপরাহত ধারণায় জনসাধারণ বুঁদ হ'য়ে আছে, আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ নয় যে জাপান ও ভারতবর্ষ একই এশিয়ার অন্তর্ভূত। এ-দুই দেশে পদে-পদে গরমিল। যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে জাপানের কারয়িত্রী প্রতিভা অবাক ক'রে দেয় আমাদের ;—কী মসৃণ ও সক্ষম এদের প্রতিটি যন্ত্র, কী নিখুঁত এদের সেবা, কী প্রকাণ্ড এদের বাণিজ্যবল, ছোটো-বড়ো সমস্ত কাজে কী নিঃশব্দ ও পূর্ণ এদের অভিনিবেশ! জগৎ-সংসারে কৃতী হ'তে হ'লে যে-সব গুণ আবশ্যক—শৃঙ্খলা, অধ্যবসায়, বিশ্লেষণশক্তি, বাস্তবধর্মিতা, বিমূর্ত ধারণার বদলে মূর্ত তথ্যের প্রতি মনোযোগ, এগুলো যেন জাপানিদের রক্তের মধ্যে মিশে

আছে, কোনোমতেই তার ব্যত্যয় হবার উপায় নেই। 'সময়ের মাপ আমাদের হ'লো মিনিট,' এক মার্কিনী বলেছিলেন আমাকে, 'আর জাপানিদের—সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ।' ঠিকই তা-ই ; ওটার একদিন বেলা দশটায় আমাদের হোটেলে আসার কথা ছিলো ; দশটার একটু আগে তিনি টেলিফোন ক'রে জানালেন তাঁর পাঁচ মিনিট দেরি হবে, আর নির্ভুলভাবে দশটা বেজে পাঁচ মিনিটেই তিনি এলেন। বক্তৃতা দিতে, বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, যখনই যেখানে গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি সময়ের হিশেব চুলচেরা ; কোনো-একটা তুচ্ছ বিষয়েও কেউ যদি কোনো কথা দিয়েছে সেই কথামতো কাজ করতে ভোলেনি ; যে-সব কাজ আমরা হীন বা কষ্টকর ব'লে ভাবি তার সম্পাদনাও অনবরত অনাহত-ভাবে অম্লান। এই লক্ষণগুলোকে আমরা সাধারণত প্রতীচ্য ব'লে ভেবে থাকি, কিন্তু এদের চরম প্রকাশ জাপানেই দ্রষ্টব্য। অনন্তবোধের বেদনার দ্বারা এরা যেন কখনোই বিদ্ধ হয়নি, কখনোই যেন স্বীকার করেনি যে মানুষের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে পারে ; সংসারের উপর এদের আস্থা

এত গভীর যে জাপানি ভাষায় ভগবানের কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই। একটি শব্দ আছে, 'কামি', তার আক্ষরিক অর্থ 'উচ্চ'; সেই উচ্চতা পার্থিব বা আত্মিক হ'তে পারে; 'আত্মা', 'দেবতা', 'পূর্বপুরুষ', শ্রদ্ধেয় বা শ্রেষ্ঠ যে-কোনো সত্তা বা বস্তু—এই সব বিভিন্ন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই শ্রদ্ধার মধ্যে পূজা বা আত্মনিবেদনের ভাবটি নেই; অগ্নি, বায়ু, মৃত্যু প্রভৃতি শক্তি কার আদেশে ধাবিত হচ্ছে, এই প্রশ্ন এ-দেশে অবান্তর। এ-দিক থেকে এরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুর ঠিক বিপরীত, আর বিপরীত ব'লেই আকর্ষণে এত শক্তিশালী। একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না, কিন্তু আমার ধারণা হ'লো যে জাপানি মানস একান্তভাবে জাগতিক, যাকে ইংরেজিতে বলে 'secular'; 'আপনার ধর্ম কী?' এই কথা অনেককে জিগেস ক'রে স্পষ্ট কোনো জবাব পাইনি; 'হয়তো বৌদ্ধ—হয়তো শিন্টো—ঠিক জানি না,' অর্থাৎ বিষয়টা চিন্তার বা আলোচনার যোগ্য নয়। ভারতের কথা ছেড়েই দিই, ধর্ম বিষয়ে এ-রকম মনোভাব প্রতীচীতেও বিরল।

কিন্তু এই কি জাপানিদের বিষয়ে সবটুকু কথা? তা যদি হ'তো, তাহ'লে এদের আমরা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিতুম জগতের সেরা কেজো লোক ব'লে, বণিকবৃত্তির চরম চূড়ায় বসিয়ে দিতুম একেবারে—আর তার পর এদের বিষয়ে আর-কিছু বলার প্রয়োজন হ'তো না। সত্য, এরা অনেক বিষয়ে ইংরেজের মতো, কিন্তু আগন্তুকের মনের উপর লণ্ডন যে-নিস্তাপ ধূসরতা ছড়িয়ে দেয়, টোকিওতে তা অকল্পনীয়, এবং এদের শত্রুরাও কখনো বলেনি যে এরা 'দোকানদার' বা 'লেজার-পূজারি' মাত্র। আশ্চর্য এই যে এদের কেজো দিকটা, অনিবার্যভাবে লক্ষণীয় হ'লেও, কখনোই যেন খুব বড়ো হ'য়ে দেখা দেয় না; সবচেয়ে আগে যা চোখে পড়ে এবং সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা মনে থাকে, তা এই যে এরা সুন্দর। আগে একবার লিখেছি: 'পাশ্চাত্ত্য জাতির যে-সব সামরিক অভ্যাস এখন সামাজিক গুণে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সবই জাপানিদের আয়ত্ত, এমনকি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচ্য লাবণ্য এদের সহজাত, এবং এ-দুয়ের মিশ্রণের জন্যই

বিদেশীর কাছে জাপান এমন মনোমুগ্ধকর।'
জাপানে দশদিন কাটিয়ে এমন-কিছু দেখলাম না,
যা এই কথাটার প্রমাণ না দিচ্ছে। একটা
ছোটো উদাহরণ দিই: পরিচ্ছন্নতা। এই
বিষয়টাতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে ব'লে
আমি দাবি করতে পারি, কেননা আমি যখনই
যে-টেবিলে লিখি, বা যে-চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম
করি, সেখানেই দুর্দমনীয়ভাবে জ'মে ওঠে
সিগারেটের ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি, বই,
চিঠিপত্র, ছেঁড়া কাগজ, বাজে লেফাফা—
দরকারি ও বেদরকারি জিনিশের এমন একটি
বিমিশ্র ও বিবর্ধমান স্তূপ, যাতে সৌন্দর্য বা
সুবিধে কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যায় না।
আমার এই অভ্যাসের জন্য দেশে-বিদেশে
বিবিধ মহিলাদের দ্বারা আমি তিরস্কৃত হ'য়ে
থাকি, এবং যদিও আমি সব সময়ে জবাব
দিই যে এই অবস্থাই আমার পক্ষে আরাম-
দায়ক, তবু কোনো করুণাময়ী কোনো-এক
সকালে আমার টেবিলটি গুছিয়ে দিয়ে গেলে,
তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি কত বড়ো একটা
পরিবর্তন ঘ'টে গেলো। মন হালকা লাগে

তখন, কাজে আরো উৎসাহ পাই, শ্রম তেমন কাতর করে না। অর্থাৎ, আমার নিজের স্বভাবে তা নেই ব'লেই, পরিচ্ছন্নতা আমার ঈপ্সিত, এবং আর-কোনো দেশে ঐ গুণটিকে আমি এমন ব্যাপক, শ্রীমণ্ডিত ও মানবিকভাবে অনুভব করিনি, যেমন করেছি জাপানে। কিয়োটোর রাস্তা এত পরিষ্কার যে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলতে স্ববস্ত্রদাহক আমার পর্যন্ত সংকোচ হয়েছে ; এবং বিরাট টোকিওতেও এমন কোনো রাস্তা আমি দেখিনি যা ন্যু ইয়র্ক বা কলকাতার কোনো-কোনো অংশের মতো আবর্জনায় বর্ণাঢ্য। ঘর বাড়ি দোকান হোটেল ট্রেন ট্যাক্সি, সবই একেবারে ঝকঝকে তকতকে ;—এদের বিষয়ে বেশি বলা বাহুল্য। কিন্তু হাকোনের সেই সরাইখানাটিকে আর-একবার স্মরণ না-ক'রে পারছি না, কেননা তার পরিচ্ছন্নতা বর্ণনাতীত—প্রায় অনির্বচনীয়। সেখানে গিয়ে যেন বুঝেছিলাম প্রতীচীর সঙ্গে জাপানের মৌলিক তফাৎটি কোন্‌খানে। আমেরিকাতেও এক-এক জায়গায় দেখেছি পরিচ্ছন্নতাকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে—কিন্তু তার ভিতরকার কথা হ'লো নির্বীজতা ও স্বাস্থ্যকরতা, তা এমন নিষ্কলঙ্ক ও নিরঞ্জন যেন হাসপাতালের আদর্শে রচিত, তার অন্তরালে প্রাণের সাড়া সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু জাপানি পরিচ্ছন্নতায় এমন একটি সৌন্দর্যবোধ আছে, আর মানুষের হাতের সেবা তার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত ব'লে মনে হয়, যে তাকে আমরা বলতে পারি মর্ম-স্পর্শী; অর্থাৎ, তা শুধু আমাদের চোখের ও দেহের পক্ষেই প্রীতিকর নয়, যেন হৃদয়ের কাছেও তার আবেদন আছে।

—কিংবা হয়তো হৃদয় কথাটা ভুল হ'লো; সবটাই সাজানো, বানানো, 'শিল্পিত', এইটেই জাপানি স্টাইল। তা-ই যদি হয়, তাহ'লে কথাটা এইখানে দাঁড়ায় যে জাপানিদের নিজস্ব একটা স্টাইল আছে, যা আমাদের নেই, বা থাকলেও বহির্জগতে এখনো প্রকাশ্য হয়নি। একদিন ওটা আমাদের নিয়ে গেলেন এক জায়গায় এদের বিখ্যাত 'টেম্পুরা' বা মাছ ভাজা খাওয়াবার জন্য। খাশ জাপানি ধরনের ভোজনালয়, মহার্ঘ নয় তা দেখেই বোঝা যায়; কিন্তু

খাদ্য সুস্বাদু, পরিচর্যা ত্রুটিহীন, আসনের ও তাপের ব্যবস্থা আরামদায়ক, ও পরিচ্ছন্নতা ব্রাহ্মণোচিত। বিদেশীদের বেশ ভিড় দেখলুম, রান্নার জন্য খ্যাতি আছে জায়গাটার। তুলনীয় কোনো রেস্তোরাঁ কি আছে কলকাতায়? এমন কোনো ভোজনালয়, যেখানে মলিন বাসন, অধ্যবসায়ী মাছি, বা অত্যধিক মশলা-প্রণোদিত অগ্নিমান্দ্যের আশঙ্কা না-ক'রে আমরা বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে খাওয়াতে পারি ধনেপাতা-সুবাসিত মুসুরির ডাল, কালোজিরে-চর্চিত স্নিগ্ধ লাউ, দই দিয়ে রাঁধা রুই মাছ, আর মিষ্টি-আদা-টোম্যাটোয় সম্পন্ন তীব্র চাটনি? না কি এমন কোনো ভদ্রগোছের হোটেল বা সরাইখানাই আছে, যার ধরনটাকে যে-কোনো অর্থে বাঙালি, বা ভারতীয় বা এমনকি প্রাচ্য বলা যায়? থাকলেও, আমি তার ঠিকানা জানি না; বিদেশীরাও তার সন্ধান না-পেয়ে অনবরত এমন সব হোটেলে ওঠেন, যা অসম্পূর্ণ ও বিমলিন-ভাবে 'বিলেতি'। সেখানকার 'পাশ্চাত্ত্য' ভোজ বিস্বাদ ও বিকল্পহীন, আর 'ভারতীয়' নামাঙ্কিত যে-খাদ্য অনেক বিদেশী সাগ্রহে আহার করেন

তা দেখে আমাদের চোখে জল আসে। আর নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদ ? তা এমন বস্তাপচা বিলেতি মাল, আর তারই মধ্যে জৌলুশ আনার চেষ্টা এমন করুণ, যে সে-বিষয়ে মন্তব্য করার প্রয়োজন দেখি না। পোল্যাণ্ড বা ইস্রায়েল বা মেক্সিকো থেকে হঠাৎ কোনো অতিথি এসে অবাক হয়—তাই তো, এদের কি নিজস্ব ব'লে কিছু নেই ? ভারত-পথিক বিদেশীরা একমাত্র যা নতুন দেখতে পায় তা হ'লো কোনো-কোনো রাজ্যে সুরানিরোধক অনুশাসন। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিতান্তই না-ধর্মী : যা সমগ্র সভ্য জগতে প্রচলিত এমন একটা ক্রিয়াকে আমরা অস্বীকার করছি মাত্র, কিন্তু এখনো এমন কিছু দেখাতে পারছি না, যা আমাদের আবহমান জীবনধারার বিশিষ্ট সৃষ্টি। আমি বলছি না সে-রকম কিছু নেই, নিশ্চয়ই অনেক আছে ;—কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই আমাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ ; সেগুলোকে—চীনে বা জাপানিদের মতো নৈপুণ্যে—বহির্বিশ্বের উপযোগী ক'রে তুলতে পারছি না আমরা, আর সে-জন্যে কোনো মহলে আক্ষেপও নেই। যদি এর পরে আমাদের

দেশে গোমাংসভোজন নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়, সেটাও একটা নূতনত্ব হবে বটে, কিন্তু সেটাতেও হাঁ-য়ের দিকে কিছু থাকবে না। এখনো কি সময় আসেনি, যখন আমরা—কলকারখানা নৌবহর বিমান-বাহিনীর ব্যাপারে শুধু নয়—দৈনন্দিন জীবনযাপনেও বর্জনের চাইতে অর্জনের দিকে উন্মুখ হবো? এখন পর্যন্ত, অন্তত বাংলাদেশে, আমাদের জীবন বড়ো বেশি পারিবারিক, জীবিকার ক্ষেত্রটুকু বাদ দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণই তা-ই; আমাদের জীবনের যে-অংশটিতে সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে তার পরিচয়, কোনো পরিবারের মধ্যে মিশতে না-পারলে, কোনো বিদেশী লোক কখনোই পাবে না। কিন্তু সত্যি কি আমরা শুধুই গৃহস্থ, জগতের আমরা কেউ নই?

জাপানি মেয়েদের বিষয়ে আগে উল্লেখ করেছি, কিন্তু যথেষ্ট বলা হয়নি। এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো যে রূপের দীপ্তিতে যদিও উত্তরভারতের কন্যারা শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতিযোগী হ'তে পারেন, তবু, সংস্কৃত কবিরা যে-ভাবে তাঁদের মানসীদের চিত্রিত ক'রে গেছেন, নম্য, পেলব, সুকুমার ও ক্ষীণকায়—

তার আংশিক প্রতিরূপ যদি কোথাও দেখা যায় তো পূর্ব-ভারতে—হয়তো বাংলায়, বা তার চেয়েও বেশি, আসামে। কিন্তু এখন দেখছি, জাপানি মেয়েরা—'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' না হোক—কোমলতায় অতুলনীয়া, যাকে বলেছি প্রাচ্য লাবণ্য তা এদের মধ্যে অবিকলভাবে মূর্ত। লাবণ্য, লালিত্য, কমনীয়তা—যে-সব লক্ষণ আমাদের কাছে বিশেষভাবে ললনাশোভন, এ-দেশের প্রতিটি মেয়েকে স্বভাবতই তার অধিকারিণী ব'লে মনে হয়, বয়স, রূপ অথবা সামাজিক মর্যাদা যেমনই হোক না। পূর্বোল্লিখিতা মাসু তরুণী ও সুরূপা হ'লেও ব্যতিক্রম নন: গলার আওয়াজ বাতাসের মতো, মুখে ও সমস্ত দেহে একটি সংবৃত ও শোভন বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে—জাপানি মেয়েদের সামান্য লক্ষণ হ'লো এই। অথচ এদের প্রায় প্রত্যেকেরই ছাঁটা চুল, সাজ পাশ্চাত্ত্য, বহির্জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না এমন কেউ নেই। দুই বিপরীতকে যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে দিয়েছে এরা: দেখলে মনে হয় পুষ্পাঘাতে

মূর্ছাপ্রবণ, কিন্তু ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে এদের ক্ষমতা ও দার্ঢ্যের পরিচয় অনবরত পাওয়া যায়। চলাফেরা দ্রুত, ব্যবহারে হিন্দু রমণীর 'লজ্জা' অথবা আড়ষ্টতা নেই, কিন্তু কখনো এমন কোনো ভঙ্গি করে না যা মুহূর্তের জন্যও মনে হ'তে পারে খর, বা অসুন্দর, বা পুরুষালি। বরং, যে-ভঙ্গিটি এদের পক্ষে সহজাত ও নিত্যনৈমিত্তিক, তা হ'লো আত্মোৎসর্গের ; যখন যে-কাজটুকু করছে তার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিচ্ছে যেন ; আর এটা যে কোনো আভিজাতিক শিক্ষার ফল তাও নয়, কেননা হোটেলের পরিচারিকা বা দোকানের কর্মিণীরাও, তাদের নিরন্তর ব্যস্ততার মধ্যে, ব্যবহারে নিরন্তর স্নিগ্ধ ও অবনম্র। চিত্রলতায় জাপানি মেয়েদের জুড়ি নেই।

জাপানি জীবনের যে-দিকটি আমার মনে গভীরতম রেখাপাত করেছে, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তা হ'লো—এ-দেশে ইংরেজি ভাষার অবস্থা। আগেই বলেছি, জাপানিরা ইংরেজি বলাতে পটু নয় ; সেই অপটুতা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয়দের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও

আলোচনাযোগ্য। বিদ্বৎ, উচ্চপদস্থ ও পণ্ডিতদের মধ্যেও এমন মানুষ অত্যন্ত বিরল, যিনি স্বচ্ছন্দে ও নির্ভুলভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে ইংরেজিতে আলাপ চালাতে পারেন। পারেন না;—তার চেয়েও জরুরি কথা হ'লো, চেষ্টাও করেন না, অত্যধিক চেষ্টাপ্রয়োগের উপযোগী ব'লেই ভাবেন না বিষয়টাকে। সাধারণ লোকেরা অনেকেই এক ধরনের কেজো ইংরেজি ব্যবহার করে; অর্থাৎ যার যা কর্ম, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভাষাটুকু এরা শিখে নেয়; সেই গণ্ডির বাইরে পরভাষার অস্তিত্ব নেই এদের কাছে। অনেক মেয়েকে দেখেছি, হাতব্যাগে প্রসাধন-দ্রব্যের সঙ্গে একটি ইংরেজি অভিধান সঙ্গে রাখে সব সময়; কোনো কথা বুঝতে না-পারলে তক্ষুনি অভিধান খুলে জেনে নেবার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, পড়ান ইংরেজি বা ফরাশি সাহিত্য, এমন অধ্যাপকও আমার কোনো-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শুধু মৃদু হেসে বা শিরসঞ্চালন ক'রে; আমার কথাটা তিনি যে বুঝতে পেরেছেন এমন কোনো লক্ষণও দেখতে পাইনি।

এই শেষের কথাটায় আমাদের দেশে অনেক ভুরু কপালে উঠবে, মনে হয়। ইংরেজি পড়ান, কিন্তু ইংরেজি বলেন না—এ কী-রকম হ'লো? খুব সোজা উত্তর: জাপানে নিম্নতম থেকে উচ্চস্তম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন অনন্যরূপে জাপানি। স্কুলে ইংরেজি একটি আবশ্যিক বিষয় —য়োরোপেও অনেক দেশে আজকাল তা-ই; কিন্তু স্কুলে কয়েক বছর অভ্যাসের ফলে সত্যিকার শেখা কতটুকু হয় তা আমরা হাল-আমলের সাধারণ ম্যাট্রিক-পাশ বাঙালি ছেলের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবো। আমাদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে ইংরেজি কম জানলে জীবিকা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধে হয় আমাদের; এদের তাতে কিছুই এসে যায় না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা—সব এ-দেশে পড়ানো হয় মাতৃভাষায়; পাঠ্যপুস্তক ও প্রশ্নোত্তর মাতৃভাষায়; গবেষণা, গ্রন্থরচনা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা—সব মাতৃভাষায়। মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হয় বাণিজ্য, সরকারি কার্য, শাসন, বিচার, বিধানরচনা—সব-কিছু। এক কথায়, যা স্বাভাবিক, আর সবচেয়ে বেশি ফলদ, আর

সমগ্র আধুনিক জগৎ যা মেনে নিয়েছে, সেই ব্যবস্থাই জাপানে বদ্ধমূল। তাই ব'লে বিদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার ভাবটি একেবারেই নেই ; পণ্ডিতেরা তাঁদের বৈশেষিক নিবন্ধ মাঝে-মাঝে ফরাশি বা ইংরেজি বা জর্মান ভাষায় প্রকাশ ক'রে থাকেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন চেষ্টাও এঁদের থাকে যাতে বিদেশীরা জাপানি শিখতে উৎসাহ বোধ করে। অনেক গবেষণা-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি ছাপা হয় জাপানিতে, কিন্তু তার ইংরেজি বা ফরাশি চুম্বক অন্যদের কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। নিজের বিষয়ে, জ্ঞানের কোনো বিশেষ উপবিভাগ নিয়ে বিদেশী ভাষায় কিছু লিখতে হ'লে এঁরা পরাঙ্মুখ হন না, কিন্তু সেই ভাষা কানে শোনার, বা মুখে বলার উপলক্ষ জাপানি বিদ্বজ্জনদের জীবনে অল্পই ঘ'টে থাকে। অনেকেই য়োরোপে বা আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁদের সমগ্র জীবনের পরিমাপে সেই কিছুদিনের প্রভাব আর কতটুকু! বৈদেশিক সাহিত্য বা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশত এঁরা প্রয়োজনীয় ভাষাটিকে গভীরভাবে পড়তে

শেখেন, এবং ছাত্রদেরও তা-ই শেখান; কিন্তু সেই ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলা যে তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত, বা তাঁদের অধিকারভুক্ত, এমন চিন্তা ছাত্র বা অধ্যাপকের মনে কালেভদ্রে উদিত হয়। সাম্প্রতিক মার্কিনী প্রভাবের ফলে ইংরেজির প্রতি ঔৎসুক্য যদিও বর্ধিষ্ণু (ওটার, দেখলুম, বিশেষ চেষ্টা যাতে তাঁর যুবক পুত্র ইংরেজিতে পাকা হ'য়ে ওঠে), তবু এমন কথা সারা জাপানে অভাবনীয় যে শিক্ষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি জ্ঞানের কোনো সম্বন্ধ আছে।

পক্ষান্তরে, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচলন বিপুল। বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না যে ইংরেজি যেখানে মাতৃভাষা নয়, এমন সব দেশের মধ্যে ঐ ভাষায় সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখা যায় সাধারণভাবে ভারতবর্ষে। এ-কথাও সত্য যে আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ইংরেজি পড়া, লেখা ও বলার ক্ষমতা ততদূর পর্যন্তই আয়ত্ত করেছেন যতদূর কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্ভব। (বিদেশীর পক্ষে একটা সীমা থাকবেই: এই পর্যন্ত, কিন্তু তার বেশি আর না।) এই অস্বভাবী অবস্থার ফলে

আমরা স্বদেশে ও বিপুল বিশ্বে অনেকগুলো সুবিধে ভোগ করছি, সে-কথাও অনস্বীকার্য। শুধু এই সুবিধেগুলোর জন্য নয়;—বম্বাইতে বা বার্লিনে কাউকে-না-কাউকে জিগেস ক'রে হোটেলের পথ জানতে পারি ব'লে নয়; লণ্ডনে বা বস্টনে বা মন্ট্রিয়ালে মাষ্টারি, ডাক্তারি অথবা কেরানিগিরি করতে পারি, শুধু সে-জন্যে নয়,* তত্ত্ব- অথবা তথ্যঘটিত কোনো

---

* কথাটা লিখেই মনে হ'লো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে য়োরোপ থেকে সম্প্রতি-আসা এমন অনেক প্রবীণ অধ্যাপক আছেন, যাঁরা আসবার সময় প্রায় কিছুই ইংরেজি জানতেন না, আর বসবাসের ফলেও যেটুকু শিখেছেন তাকে যথোচিত বললে বেশি বলা হয়। কিন্তু তাঁরা নিজ-নিজ বিষয়ে অসামান্য পণ্ডিত ব'লে, তাঁদের ক্ষীণ শব্দকোষ ও অদ্ভুত উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে সম্মান- ও প্রতিপত্তিলাভের অন্তরায় হয়নি। অবশ্য তাঁরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী ব'লে আমার ধারণা—আর বিজ্ঞানে ভাষার ব্যবধান দুরপনেয় নয়, কিন্তু সাহিত্যেরও এমন অধ্যাপক দেখেছি, যাঁরা জর্মান বা ইটালিয়ান সাহিত্যে পারঙ্গম, কিন্তু যাঁদের ইংরেজি এখনো বাধো-বাধো।

আলোচনা জরুরি হ'য়ে উঠলে, তা কোনোরকমে অবাঙালির সামনে প্রকাশ ক'রে উঠতে পারি, সে-জন্যেও নয়;—ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা জগতের উপর ঐ একটিমাত্র জানলা আমাদের খোলা আছে। যে-শুভদিনে আমাদের মধ্যযুগ-মানসতা সর্বতো-ভাবে লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তার আগেই যদি ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষ থেকে স'রে যায়, তাহ'লে আমরা পুনর্বার যে-অন্ধকারে তলিয়ে যাবো তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। ইংরেজি ভাষার জন্য নয়, তার মধ্য দিয়ে বিশ্বের যে-বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে, আবহমান মানবসভ্যতার যে-বীজময় সংস্পর্শ আমরা পাচ্ছি, তারই জন্য তা মূল্যবান। তারই জন্য আমরা মানতে বাধ্য যে আমাদের জীবনের মধ্যে ইংরেজির অস্তিত্ব মঙ্গলজনক, আর যাতে অকস্মাৎ কোনো অন্ধতার ফলে তা দূর হ'য়ে না যায় তার জন্যও আমাদের প্রযত্ন বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু—এই প্রশ্নটাই আসল—আজকের দিনে ইংরেজি যে-ভাবে আমাদের অধিকার ক'রে আছে, সেটা কি ভালো? ভালো কেমন

ক'রে বলি, যখন দেখছি পৃথিবীর মধ্যে শুধু হতভাগ্য আমরাই এক পরভাষার পুতুল-পুজো করছি এখনো, তার দ্বারা লভ্য আত্মার সন্ধান না-ক'রে শুধু খোলশ নিয়ে মহোৎসাহে মেতে আছি? সাড়ম্বর, মধ্য-ভিক্টোরীয়, 'ক্লিশে'-পুষ্পিত, বহুমাত্রিক লাতিন শব্দে মরচে-পড়া শিকলের মতো ঝনৎকৃত, ব্যাকরণে এমন অভ্রভেদীভাবে নির্ভুল যে মনে হয় কোনো মুখস্থ-করা মৃত ভাষা আওড়ানো হচ্ছে—এমন ইংরেজি তো ভারতবর্ষীয় অধ্যাপকের মুখে ছাড়া আজকের দিনে আর কোথাও শোনা যাবে না। আমরা যারা নিজেদের ভাবি ইংরেজিতে ওস্তাদ, বা অন্যদের তা ভাবতে দিই আমাদের বিষয়ে—সেই আমাদের ইংরেজিতে ভুল হয়তো কমই থাকে, কিন্তু তেমনি থাকে না গতি অথবা জীবনীশক্তি, ভুল এড়াবার কঠিন চেষ্টাতেই অবসন্ন হ'য়ে পড়ি আমরা, আক্ষরিকতার কচুরি-পানায় আমাদের বক্তব্য দম আটকে ম'রে যায়। আর আমাদের মধ্যে যাঁরা কয়েক মাস 'ইউ. কে.'-তে* কাটিয়ে

* হায় ব্লেক, ব্রাউনিং, চেস্টার্টনের ইংলণ্ড—তুমি অবশেষে 'ইউ. কে.'তে অধঃপতিত হ'লে!

এসেছেন, বা হয়তো পাঠ নিয়েছেন জ্যোতিষ্মান অক্সফোর্ডে অথবা কেম্ব্রিজে, তাঁরা ইংরেজি ভাষার কুটিল অ্যাকসেণ্টগুলিকে কণ্ঠে খেলাবার জন্য এমন কঠিন সাধনা করেন যে কখনো কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্যুতি হয়েছে টের পেলে তাঁরা হয়তো—চেখভের গল্পের সেই কেরানির মতো, যে বড়োবাবুর টাকের উপর হেঁচে ফেলে তারপর আর মনের শান্তি ফিরে পায়নি—কে জানে, হয়তো বা সেই করুণ কেরানির মতোই তাঁরা শয্যা নিয়ে শয্যা ছেড়ে আর উঠবেন না।

আর-একটি কথা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য: আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার সত্যিকার কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি? যেহেতু ভারতের একটি বড়ো অংশে মধ্যযুগের তিমির এখনো নিবিড়, সেইজন্য ইংরেজি আমাদের পক্ষে উপকারী ও প্রয়োজনীয়, এমনকি তাকে অপরিহার্য ব'লেও আপাতত মানা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত—তা মনে রাখা চাই; অকস্মাৎ কোনো বিরাট দুর্ঘটনা না-ঘটলে এমন একদিন আসবেই, যখন আধুনিক মানসতা সার্বিকভাবে

ব্যাপ্ত হবে আমাদের মধ্যে ; সেদিন ভারতবর্ষীয় ইংরেজি নিজে-নিজেই শীর্ণ হ'য়ে যাবে, তাকে সগর্বে বহন ক'রে বেড়াবার মতো অধ্যাপকীয় কাঁধও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই পরিণতির জন্য আমরা যত বেশি প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে পারি ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। ইংরেজি শেখার বিরুদ্ধে আমি বলছি না ; কিন্তু সেই শিক্ষা ভৃত্যের ধরনে না-হ'য়ে সমকক্ষ বিদেশীর ধরনে হোক, এটুকু আমার বক্তব্য। মানুষের চিন্তা, চেষ্টা ও সৃষ্টির বাহন শুধু তার মাতৃভাষাই সার্থকভাবে হ'তে পারে, এই কথাটা অঙ্গীকৃত হ'লে পরভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ কী-রকম বদলে যায়, জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখলে তা বুঝতে দেরি হয় না।

তুলনা করলে মনে হয়, আমরা এত যত্ন নিয়ে ইংরেজি শিখেও—বা সেইজন্যেই—জাপানিদের কাছে মৌলিকভাবে হেরে আছি। পৃথিবীর দিকে তার দরজা যেদিন খুলে গেছে প্রায় সেদিন থেকেই জাপান আধুনিক,—সেই আধুনিকতা তত্ত্বগত নয়, তথ্যনির্ভর—অতএব ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন

এদের কখনোই হয়নি, তার সঙ্গে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এদের মৌখিক ইংরেজির কোনো দাবি-দাওয়া নেই; তার ব্যাকরণহীনতা ও অস্পষ্ট উচ্চারণ সরলভাবে বৈদেশিকতা ঘোষণা করছে, আর এদের খবর-কাগজের মার্কিনী-ঘেঁষা ইংরেজি অন্তুতপক্ষে সচল ও ঝকঝকে—পাঠ্যবইয়ের এঁটোকাঁটায় ছিটোনো নয়। বিদেশীরা ভারতে এসে অর্জন করেন ধনমান, কিছুটা সামাজিক মেলামেশাও ক'রে থাকেন, বছরের পর বছর বা সারা জীবন কাটিয়ে দেন হয়তো—অথচ তার জন্য (দু-কুড়ি-খানিক ভৃত্যভাষিত হিন্দি শব্দ ছাড়া) আমাদের কোনো ভাষার একটি অক্ষরও তাঁদের শিখতে হয় না। আর জাপানে জাপানি না-জানলে কিছুই করা যাবে না;—না ব্যাবসা, না অধ্যয়ন বা শিক্ষকতা, না বিবাহ বা বসবাস। এটাই আসল কারণ, যার জন্য নানা ভাষায় জাপানি সাহিত্যের এত বেশি অনুবাদ হয়েছে ও হচ্ছে, আনকোরা আধুনিক সাহিত্যও বাদ পড়ছে না; এদিকে বিদেশীর ভারতবিদ্যা বা 'ইণ্ডলজি' এখনো প্রত্নতত্ত্বের

জাতুঘরেই আবদ্ধ। দুটি তরুণ মার্কিনের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো, তারা অনর্গল জাপানি বলছে, দেশটাকে খুব ভালো লাগছে ব'লে এখানেই দীর্ঘকাল তাদের থাকার ইচ্ছে। আমেরিকায় জাপানি-জানা লোকের সংখ্যা আজকের দিনে নেহাৎ নগণ্য নয়; বড়ো-বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি বিভাগগুলি জীবন্ত;—এর একটা কারণ নিশ্চয়ই যুদ্ধ, বা কিছুটা অ্যাটম-বোমার 'বিবেকমূল্য'ও হ'তে পারে, কিন্তু এর প্রধান কারণ এই যে জাপানের সঙ্গে যে-কোনো প্রকার স্থায়ী ও ফলপ্রসূ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হ'লে প্রথমেই তার ভাষায় অভিজ্ঞতা চাই। এরা জাপানি শিখতে বাধ্য করেছে বিদেশীদের, আমরা ইংরেজি শিখে নিজের ভাষাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছি না;—আর সেইজন্য আমাদের মনের কথা, হৃদয়ের কথা এখনো বিশ্বজগতে পৌঁছলো না। কোনদিকে পাল্লা ভারি তা না-বললেও চলে।

কিন্তু হয়তো ইংরেজিকে 'অবহেলা' করার ফলে জাপানের অন্য দিকে ক্ষতি হয়েছে? হয়তো জগতের জ্ঞানে ও বিদ্যায় আমরাই

বেশি ওয়াকিবহাল?—দুঃখিত, ঠিক উল্টো কথাটা সত্যি। শুধু বিজ্ঞানে নয়, সাহিত্যেও এরা বিশ্বনাগরিক, এদের তুলনায় আমরাই বরং প্রাদেশিক হ'য়ে আছি—যে-আমরা ইংরেজ ইস্কুলমাষ্টারের চোখ দিয়ে এখনো দেখি জগৎটাকে, যাদের কাছে 'ইংরেজি' ও 'প্রতীচ্য' প্রায় সমার্থক। যে-ইংরেজি ভাষা জগতের উপর আমাদের জানলা, সেটাই—এমনি ভাগ্যের বিদ্রূপ—আমাদের জগতের উপর পরদা টেনে দিয়েছে। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয় তাদের মধ্যে আছে—ইংরেজি ছাড়া—ফরাশি, জর্মান, ইটালিয়ান, গ্রীক-ও-লাতিন। এতগুলো প্রতীচ্য সাহিত্য পড়ানো হয় এমন কোনো ভারতীয় বিদ্যালয়ের কথা আমার জানা নেই, কিন্তু জাপানে আরো বেশি উদার আয়োজন দুষ্প্রাপ্য নয়। এদের তুলনামূলক সাহিত্যসংস্থার সভ্যসংখ্যা বিপুল, এবং এই সংস্থার একটি কাজ হ'লো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগসাধন। দেখে, শুনে, ও পত্রিকাদি প'ড়ে অনুমান করছি যে প্রতীচ্য

সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে অন্য কোনো প্রাচ্য ভাষা জাপানির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আমাকে এক সভায় নিয়ে যাবার জন্য একদিন একটি মেয়ে এলো, সে সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে, গাড়িতে যেতে-যেতে তাকে জিগেস করলুম সে য়োরোপীয় সাহিত্য কিছু পড়েছে কিনা। সে তার যৎসামান্য ইংরেজিতে আমাকে জানালে যে সে ডস্টয়েভস্কির প্রগাঢ় ভক্ত, টলস্টয়, ফ্লোবেয়ার, স্তাঁদাল তার অজানা নেই। আর এ-সব বই সে পড়েছে তার মাতৃ-ভাষাতেই, অন্য বহু শ্রেষ্ঠ লেখক অনুবাদে তার অধিগম্য, 'ইউলিসিস'-এর মতো দুর্ধর্ষ পুস্তকের একাধিক অনুবাদ প্রচলিত আছে। এই অনুবাদগুলো ভালো না মন্দ তা আমার পক্ষে অভিজ্ঞতার অতীত হ'লেও ধারণার বহির্ভূত নয়, কেননা জাপানে সাহিত্যচর্চার ব্যাপ্তি ও নিবিড়তা দেখে বিশ্বাস হয়* যে দেড়শো

* পরে এক স্যুইস-জর্মান-মার্কিন অধ্যাপকের মুখে শুনলাম যে জর্মান সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় জাপানিরা আজকাল অন্যতম অগ্রণী।

পৃষ্ঠায় একটি তথাকথিত 'আনা কারেনিনা' প্রকাশ করা এদের পক্ষে অসম্ভব, এবং পূর্বোক্ত মেয়েটি যে ডস্টয়েভস্কি প'ড়ে আনন্দ পেয়েছে, সেটাও অনুবাদের গুণপনারই প্রমাণ। আমরা বাঙালিরা সাহিত্যপ্রেমিক ব'লে শুনতে পাই, কিন্তু আমাদের ভাষায় অনুবাদ কেন সাধারণত যত্নহীন ও পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর? তার কারণ আমাদের এই অদ্ভুত ও অর্ধোচ্চারিত ধারণা যে অনুবাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই, কেননা ইংরেজিতে প্রায় সমগ্র য়োরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ পাওয়া যায়, আর দেশের মধ্যে শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন। শিক্ষিত লোকমাত্রেই ইংরেজি পড়েন? না কি, যাঁরা ইংরেজি পড়েন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত ব'লে গণ্য? না কি—আরো মারাত্মক কথা —যাঁরা ইংরেজি জানেন না তাঁরাই অশিক্ষিত ও ডস্টয়েভস্কি পড়ার অযোগ্য? এই সবগুলো কথাই আমাদের মনের তলায় কাজ করছে। আমরা যেন ভাবতেই পারি না—যদিও এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা মাত্র—যে ভারতবর্ষে এমন লোক অসংখ্য যারা মাতৃভাষায় ডস্টয়েভস্কির

জন্য ক্ষুধিত হ'য়ে আছে, আর এমন লোকেরও অভাব নেই যারা উত্তম ইংরেজি জেনেও বুদ্ধির ব্যায়ামের জন্য শুধু অগাথা ক্রিস্টি পাঠ ক'রে থাকেন। তাছাড়া, মাতৃভাষায় যদি বা কোনো যত্নসাধিত অনুবাদ দৈবাৎ বেরিয়ে যায়, আমরা কেমন বাঁকা চোখে তাকাই তার দিকে ; কোনো-এক অজ্ঞেয় কারণে আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা যেন সম্ভব হয় না যে সুধীন্দ্র দত্তর অনুবাদে পোল ভালেরি ধরা পড়েছেন, বরং তার তুলনায় অক্ষম কোনো ইংরেজি অনুবাদ হাতে এলে আমরা ব'র্তে যাই। কিন্তু জাপানিদের মনের কথাটা এই রকম : ইংরেজিটা অনুবাদ, জাপানিটাও তা-ই, অতএব যদি মূলে পৌঁছতে না পারি নিশ্চয়ই আমার নিজের ভাষাতেই পড়া ভালো। আর-এক কথা : যদি ইংরেজিতে অনুবাদ সম্ভব হ'য়ে থাকে, নিশ্চয়ই জাপানিতেও হ'তে পারে। জাপানিরা অন্য যে-কোনো জাতির সমকক্ষ ব'লে ভাবে নিজেদের, বরাবর তা-ই ভেবেছে, আর আমাদের এখনো কল্পনা করার সাহস হয় না যে আমরা শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ। তলিয়ে

দেখলে, একেবারে ভিতরকার কথাটা হ'লো এই।

১৩৪ এমন একদিন ছিলো যখন গঙ্গাতীরবাসী তীক্ষ্ণচক্ষু সংস্কৃত-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সহনশীল সমালোচকের দৃষ্টিতে নবাগত শ্বেতাঙ্গদের দেখেছিলেন। সেই সহজ ও অনাক্রমণীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ, যা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরে মূর্ত হয়েছিলো, কোথায় তার স্মৃতিচিহ্ন আজকের দিনে? এখন, স্বাধীনতার পরে, বক্তৃতায় ও বুলিতে ফেনিল হ'য়ে উঠছে দেশাত্মবোধ, কিন্তু বাস্তবে আমাদের আত্মসম্মানবোধ কত দুর্বল, কী-রকম প্রায় অস্তিত্বহীন আমাদের আত্ম-বিশ্বাস, আর সেইজন্য—আমরা যাকে বলি 'আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি', তার নাবালকদশা কী-রকম দুরতিক্রম্য—এই সবই আমরা জানতে পারি বক্তৃতা ভুলে তথ্যের দিকে মনোযোগ দিলে। মহাত্মা গান্ধী যাকে বলেছিলেন দাস-মনোভাব তা যে আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি তার প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের ইংরেজির প্রতি অসহায় ও কাতরতাময় মুগ্ধতা। ইংরেজির সামাজিক মর্যাদা বা স্নব-মূল্য, ক'মে

যাওয়া দূরে থাক, সম্প্রতি বরং আরো বেড়েছে,* এবং ভাষা থেকে এই মোহ সঞ্চারিত হয়েছে নতুন ক'রে তাদের প্রতি, যারা শ্বেতাঙ্গ, আর অ ত এ ব আমাদের চেয়ে উন্নত। ঐ 'অতএব'-এর যুক্তি কী, তা জিজ্ঞাস্য বা আলোচ্য নয়, কেননা সরকারি ও বেসরকারি, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়িক, উচ্চ ও নীচ— সব মহলে এই কথাটাকে নিঃশব্দে মেনে নেয়া হয়েছে যে শ্বেতাঙ্গরা সমগ্র ও স্বতন্ত্রভাবে আমাদের নিজেদের চাইতে অধিক শ্রদ্ধা-ভাজন। (এবং এই রকম ভাবি ব'লে আমরা সত্যই নিকৃষ্ট হ'য়ে আছি; আমাদের প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণ দৃষ্টি, সর্বব্যাপারে মফস্বলি মনোভাব—এ-সবের কারণই হ'লো এক প্রেতপ্রতিম ইংরেজির প্রতি আমাদের সম্মোহন—আমাদের এই সহজ কথাটা উপলব্ধি

* এর একটা প্রমাণ আমাদের দেশে নবোদগত 'ইংলিশ-মিডিয়ম' বিদ্যালয়গুলি—যেখানে, শিক্ষার সারাংশ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না-ক'রে, বহু ব্যয়ে সন্ততিদের পড়াতে পেরে অনেক পিতামাতা কৃতার্থ বোধ করছেন।

করার অক্ষমতা যে সত্যিকার পূর্ণরক্তবান ইংরেজি—বহুদূরবর্তী দেশসমূহের যা মাতৃভাষা—তা কখনোই, কোনো অর্থেই 'আমাদের' হবে না, হ'তে পারে না—আর তার প্রেতচ্ছায়াকে আঁকড়ে থাকলে আমরা সভ্যতার প্রান্তিক বাসিন্দামাত্র হ'য়ে থাকবো।) কোনো বিদেশী গুণী ক্ষণকালের জন্য আগত হ'লে তাঁকে বিশেষ আতিথ্য ও অভিনিবেশ নিশ্চয়ই দেবো আমরা—সেটাই স্বাভাবিক ও সেটাই সভ্য আচরণ; কিন্তু যে-কোনো দিকে ঈষৎ নামজাদা কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কলকাতায় এলে আমরা যে-রকম বিহ্বল হ'য়ে পড়ি তাতে তাঁরাই হয়তো মনে-মনে লজ্জাবোধ করেন। আমাদের ভাবটা হয় ভক্তিভরে করজোড়ে কাছে যাওয়ার মতো, যেন তাঁকে মাষ্টারমশাইয়ের চেয়ারে বসিয়ে আমরা সদ্য-কলেজে-ঢোকা ছাত্রের মতো বাছা-বাছা প্রশ্ন করছি—আর আমাদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ বা দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক, অন্য কারো সাহিত্যিক হিশেবে খ্যাতি আছে। পশ্চিম বাংলার যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় জীবনানন্দ দাশ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে কখনো কবিতা

১৩৬

শোনাতে আহ্বান করেননি, বা ক'রে থাকলেও তাঁদের উপস্থিত করেছেন শূন্যপ্রায় কাষ্ঠাসন-শ্রেণীর সামনে, সে-সব বিদ্যালয়েই কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ কবি উদিত হ'লে ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকেরা পুঞ্জিত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় কাব্যসুধা পান করেছেন—সেই সব ছাত্রেরাও, যারা দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথ নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে পারে না, এবং সেই সব অধ্যাপকও, যাঁরা সমকালীন কবিতার বিষয়ে 'গর্ভিণীর অরুচি' নিয়ে সাধারণত স্বাস্থ্যকরভাবে কালাতিপাত ক'রে থাকেন।* এ-রকম অবস্থায় কী ক'রে বলি যে মনের দিক থেকে আমাদের স্বাধীনতালাভ সার্থক হয়েছে ?

ভারতে উচ্চশিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হ'তে

---

* ভারতে প্রকাশিত একখানা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী গ্রন্থে দুটি শংসাপত্র হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে, তাদের প্রণেতা রবার্ট ফ্রস্ট ও আলবের্ট শোয়াইটজার। শোয়াইটজার 'ভারতের গ্যেটে' রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার একটি হ'লো 'charming'; মরণোত্তর রবীন্দ্রনাথকেও শ্বেতাঙ্গরা পিঠ না-চাপড়ালে আমরা পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করি না।

পারে কি পারে না, এ নিয়ে অফুরন্ত বিতর্ক চলছে দেখে আমি অফুরন্তভাবে বিস্মিত হ'য়ে আছি। মনে হ'তে পারতো, এ-বিষয়ে শেষ কথা রবীন্দ্রনাথই ব'লে গিয়েছেন, কিন্তু স্বাধীন ভারত তার সাম্প্রতিক আলোচনা ও আচরণ দ্বারা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে অপরিমাণ পুতুল-পুজো ভিন্ন 'গুরুদেবে'র আর-কিছু প্রাপ্য নেই। কেমন সন্তুষ্টচিত্তে অনেকেই বলছেন বা ভাবছেন যে পৃথিবীর সব দেশেই যা সম্ভব হয়েছে, যার কোনো ব্যতিক্রম আধুনিক জগতে অচিন্তনীয়, তা অসম্ভব শুধু ভারতবর্ষে, যে-দেশের অবিচ্ছেদ সভ্যতার বয়স অন্ততপক্ষে তিন হাজার বছর! বিতর্কের কোনো কারণ নেই আমি তা বলি না, নিশ্চয়ই একটি বিপুল বাধা আছে, তার নাম—জাড্য। 'আমি ইংরেজিতে শিক্ষালাভ করেছি, আমার পিতা ও পিতামহও তা-ই করেছেন, এবং আমি যে পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে শিক্ষাদান ক'রে আসছি তাও ইংরেজিতে; আমার ছাত্রকুল নানা স্থলে ছড়িয়ে ইংরেজিতে শিক্ষাদানে নিযুক্ত, আবার তাদের ছাত্ররাও তা-ই করছে অথবা করবে—

অতএব কী ক'রে কল্পনা করা যায় যে ইংরেজির বদলে হঠাৎ এসে জুড়ে বসবে বাংলা অথবা মরাঠি অথবা তামিল ?' এটা কোনো যুক্তি নয় অবশ্য, কিন্তু তা নয় ব'লেই মনোজ্ঞ—অন্তত এটা সবচেয়ে অপ্রতিরোধের রাস্তা, এটাকে মেনে নিলে নতুন ক'রে কোনো চেষ্টা অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংলগ্ন অন্য একটা প্রশ্ন আছে—আসলে বোধহয় সেটাই মৌলিক : মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয় কিনা, সত্য কিনা এই ধারণা যে ইংরেজের ছেলে যেমন ইংরেজিতে, তেমনি বাঙালির ছেলে বাংলায় পড়লে যা শিখবে তা যে-ভাবে তার মনে, প্রাণে, রক্তে গিয়ে মিশবে, সে-রকম কোনো পরভাষার দ্বারা হ'তেই পারে না। আর যদি প্রমাণ হয় যে এই ধারণায় ভুল নেই, তাহ'লে আর তর্ক কিসের। তাহ'লে বাকি থাকে শুধু জাড্যকে জয় করার প্রশ্ন, আর কিছু ব্যবস্থাপনার সমস্যা। সে-বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমরা যদি স্থিরচিত্তে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে সেই ভাষার বর্তমান অভাব পূরণ হ'তে দেরি হবে না, অনিবার্যভাবে

দেখা দেবে পাঠ্যপুঁথি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, এবং কালক্রমে ঐ ভাষাতেই নতুন জ্ঞান সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ, যুগপৎ আমাদের ভাষা হবে আরো পরিণত, এবং শিক্ষা আরো প্রাণবন্ত ও সারবান। কিন্তু যদি আমরা ভীরুতাবশত কেবলই পেছিয়ে যাই, যদি আমরা অনবরত ভাবি যে আমাদের মাতৃভাষা এখনো 'উপযোগী' হয়নি, তাহ'লে তার পরিণতির সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করা হবে। যেমন জলে না-নামলে সাঁতার শেখা যায় না, এও তেমনি।

এ-বিষয়ে আমাদের পক্ষে উজ্জ্বলতম উদাহরণ জাপান। উজ্জ্বলতম এইজন্যে যে জাপানও এশিয়া, আর এশিয়ার মধ্যে তার অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। এই অভ্যুত্থানের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে এখানে নব্যতম, প্রতীচ্যতম বিদ্যাও মাতৃভাষাতে বিকীর্ণ হয়েছে; জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েও, কখনো পরভাষার দাসত্ব করার মতো আত্মঘাতী ভুল করেনি। অসংখ্য বার, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সুস্পষ্ট ভিন্ন

মত সত্ত্বেও, এ-রকম কথা বলা হ'য়ে থাকে যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সাহিত্য প্রভৃতি মানবিক বিদ্যায় যদি বা সম্ভব হয়, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় ইংরেজি নাকি অপরিহার্য। আসলে, বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যাতেই বাধা অল্প, কেননা তাতে ভাষার ব্যবহার সীমিত ও বৈশেষিক, ভাষার বদলে চিহ্নের ব্যবহার ব্যাপক, এবং আন্তর্জাতিক চিহ্ন ও পরিভাষাসমূহ সব ভাষার সামান্য সম্পত্তি। কিন্তু আপাতত এই তর্কের মধ্যে না-গিয়ে শুধু একটি প্রশ্ন উত্থাপন করি : বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় অধিক অগ্রসর কে—ইংরেজিনবিশ আমরা, না কি এই জাপানিরা, যারা মাতৃভাষায় শিক্ষিত হ'য়ে তার দ্বারাই সর্ব কর্ম চালনা ক'রে থাকে? (আমার অনুরোধ: এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে কেউ যেন নিজেকে বিব্রত না করেন।)

২

সকাল। গোছ-গাছ ক'রে তৈরি হচ্ছি এমন সময় জাপান এয়ার-লাইন্স থেকে টেলিফোন এলো : প্লেন বিলম্বিত। লোকটি প্রীতিকর কণ্ঠে জিগেস করলে আমাদের ন্যাশনালিটি কী, এবং আমরা কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্য ইচ্ছা করি কিনা। আমি জানিয়ে দিলুম আমরা শাকাহারী নই।

সুন্দর দিন; যে-পোর্টারটি গাড়িতে আমাদের মাল তুলে দিলে সে সুশ্রী; এয়ার-পোর্টের যুবক কেরানিটি, আমার মনে হ'লো, আমাদের মালের ওজন কিঞ্চিৎ বেশি হওয়া সত্ত্বেও কোনো আপত্তি করলে না। উঠে আসতে হ'লো দোতলায়, আমাদের দেখামাত্র শ্রীমতী ওটা এগিয়ে এলেন। তাঁর স্বামী আজ জরুরি

কাজে ব্যস্ত; তিনি এসেছেন ছু-জনের হ'য়ে আমাদের বিদায় জানাতে। জানতেন না প্লেনের দেরি হবে; ট্রেনে, বাস্-এ বহুদূরবর্তী বিমানবন্দরে এসে ছু-ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা করছেন। তাও মাত্র দশ মিনিটের জন্য দেখা হ'লো। কিন্তু সময়ের অভাব, ভাষার অভাব, উভয় পক্ষের বিদায়বেদনাকে কিছুই অব্যক্ত রাখতে পারলে না।

এমন একটা সময় আসেই যখন আর পিছনে তাকানো যায় না, বা তাকালেও চেনা মানুষ হারিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, হস্টেসের হাসি, যাত্রীদের স্বর, প্লেনের ভিতরে সুগন্ধ ও রেডিওর গান, হাত-মালগুলো গুছিয়ে রাখার চঞ্চলতা। তারপর দরজা বন্ধ করার শব্দ, উপসাগরের উপর দিয়ে প্লেন উঠলো মহাশূন্যে।

প্রকাশক : শ্রী সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলকাতা ১২

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩